

ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଂକଳନ



ହେଉନେ ଆରା ଇତ୍ତିମ୍



আমার লেখা

সংকলন

হোস্তে

মোসাহেব কামরুজ্জামান
২১/১৩, যাদব রোড
মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭



নাগরিক প্রকাশন



আমার লেখা
সংকলন
হোসনে আরা ইদ্রিস

মোসাহ সামজিকাইর
২১/১৩, বাবর রোড
বোগুড়াপুর, ঢাকা-১২০৭



নাগরিক
প্রকাশন



আমার লেখা
সংকলন
হোসনে আব্দা ইদ্রিস

ষষ্ঠি : লেখক

প্রকাশক : নগরিক প্রকাশন
সি-১১, বেইলী রিজ, নটক সরণী
১ নিউ বেইলী রোড, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকাল : জানুয়ারি, ২০১৮

প্রচ্ছদ : শেখ ফারুক আহমেদ

অঙ্গর বিন্যাস : অধ্যেষা কম্পিউটার্স

মুদ্রণ : অধ্যেষা কম্পিউটার্স
৩২৯ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মার্কেট, কাঁচাবন, ঢাকা
ফোন: ৯৬৭৬৩২৫, ০১৭১২-১০৫৯৬৪

মূল্য : তিনি শত পঞ্চাশ টাকা

উৎসর্গ

বাবা মরহুম নজিমুদ্দিন, যা মরহুম শরিফুল্লেহ
স্থামী মোঃ ইদ্রিস মিয়া, মেয়ের জামাই পাষ্ঠ,
সুখী, সোমা আমার কন্যা,
আদরের একমাত্র নাতনী সামায়েরা,
ভাই-বোন ও আমার পদচলার
ওভাকাঞ্জি।

আমার লেখা

সংকলন

হোসনে আরা ইদ্রিস

অনেক দিন ধরে ভাবছি কিছু লিখব, বিভিন্ন
মাঝে মধ্যে প্রবন্ধ লিখি, তাৎক্ষণিক তাগিদে।

ছেট বেলা থেকেই বিভিন্ন কুল ম্যাগাজিন, দেয়াল
পত্রিকা বড় হয়ে নানান সংগঠনের স্মরণিকায় লিখেছি।
ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রবন্ধ লিখতে স্বাচ্ছন্দবোধ করি।

নতুন করে আরও কিছু লিখলাম আর ভাবলাম
এবার সব একত্র করে সংকলন আকারে নতুন প্রজন্য
আমার আপনজন-চেনা পরিচিতির জন্য বই আকারে
রেখে যাই, তাই এই প্রয়াস।

আমার-আমি বই আমি বলেছি আমি কোন লেখিকা
নই। শুধু মনের তাগিদে কিছু লিখি। ভুলভাস্তি ক্ষমার
চোখে দেখবী, এই গ্রন্ত্যাশা বিশেষ করে নতুন
প্রজন্যদের কাছে।

সূচিপত্র

মন ও জীবন	০৯
সৃষ্টি থাকার সহজ উপায়	১০
নারীর অবস্থান	১৫
“শিশুর জন্মের পূর্বে ও পরে সচেতনতা”	১৭
অকাতঙ্গলি	১৯
একাত্তরের শৃতি	২২
জীবন কেমন হওয়া উচিত	২৫
৮ই মার্চ	২৮
সামাজিক অবক্ষয় আজ কোন পর্যায়ে	৩১
নারীর অবস্থান কোথায়?	৩৬
সম্পর্ক	৩৯
কু-সংস্কার	৪৪
সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী কে?	৪৭
অন্তরে তুমি আছো	৫০
উত্তরা লেডিজ ক্লাব বিদ্যালয় প্রসঙ্গে কিছু কথা	৫১
নারীর উন্নয়ন	৫৪
গার্হস্থ্য অর্থনীতির গুরুত্ব	৫০
সুখ কি?	৬৩

আমার লেখা

সংকলন

হোসনে আরা ইদ্রিস

অনেক দিন ধরে ভাবছি কিছু লিখব, বিভিন্ন
মাঝে মধ্যে প্রবন্ধ লিখি, তাৎক্ষণিক তাগিদে।

ছোট বেলা থেকেই বিভিন্ন সুল ম্যাগাজিন, দেয়াল
পত্রিকা বড় হয়ে নানান সংগঠনের স্মরণিকায় লিখেছি।
ব্যক্তিগতভাবে আমি প্রবন্ধ লিখতে স্বাচ্ছন্দবোধ করি।

নতুন করে আরও কিছু লিখলাম আর ভাবলাম
এবার সব একত্র করে সংকলন আকারে নতুন প্রজন্য
আমার আপনজন-চেনা পরিচিতির জন্য বই আকারে
রেখে যাই, তাই এই প্রয়াস।

আমার-আমি বই আমি বলেছি আমি কোন লেখিকা
নই। শুধু মনের তাগিদে কিছু লিখি। ভুলভাস্তি ক্ষমার
চোখে দেখবী, এই অত্যাশা বিশেষ করে নতুন
প্রজন্যদের কাছে।

সূচিপত্র

মন ও জীবন	০৯
সৃষ্টি থাকার সহজ উপায়	১৫
নারীর অবস্থান	১৫
“শিশুর জন্মের পূর্বে ও পরে সচেতনতা”	১৭
অক্ষাঞ্জলি	১৯
একাত্মের শৃতি	২২
জীবন কেমন হওয়া উচিত	২৫
৮ই মার্চ	২৮
সামাজিক অবক্ষয় আজ কোন পর্যায়ে	৩১
নারীর অবস্থান কোথায়?	৩৬
সম্পর্ক	৩৯
কৃ-সংকার	৪৪
সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী কে?	৪৭
অন্তরে তুমি আছো	৫০
উত্তরা লেডিজ ক্লাব বিদ্যালয় প্রসঙ্গে কিছু কথা	৫১
নারীর উন্নয়ন	৫৪
গার্হস্থ্য অধিনীতির উরাত্ত	৬০
সুখ কি?	৬৩

মধ্য বয়সের সমস্যা	৬৬
“শিক্ষা হল স্বাধীনতার চাবি বা মূলমন্ত্র”	৭০
স্পৰ্শ	৭২
ভাল মানুষ কারে কয়?	৭৪
“গুরুকরের ফাঁকি”	৭৬
“সুন্দরের সংজ্ঞা”	৭৮
মৃত্যু-কষ্ট	৮০
“নায়রা জলপ্রপাত”	৮২
সুখের সংজ্ঞা	৮৫
পরিবর্তনের ত্রুমধারা	৮৭
ঢাকা উইমেন কলেজ প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষা	৯০
তৌফিকা মাহমুদ এর জীবনী	৯৩
সামাজিক পরিস্থিতি এবং বর্তমানের আমরা	৯৫
কোথায় পাবো তারে	৯৯
“শেষ কোথায়”	১০৪
বিয়ে	১০৭
জন্ম ক্রাবের ইতিহাস	১১৩
চলার পথে যাদের পেয়েছি	

মন ও জীবন

মাত্র দুটি অঞ্চল কিন্তু তার বিস্তৃতি বিশাল, মানুষ এবং মন এমনভাবে একত্রিত যা আলাদা করে চিহ্নিত করা যায় না।

মন থাকে মানুষের অন্তরে, সেই মন কথনও খারাপ থাকে, আমরা প্রসঙ্গত বলে থাকি। মন কিন্তু দেখা যায় না, কিন্তু অনুভব করা যায়।

মন খারাপ বা মনের আনন্দ নির্ভর করে পরিবেশ এবং পরিস্থিতির ওপর। কোন একটা ঘটনা যা ভাল-মন্দ হতে পারে তার উপর নির্ভর করে মনের আবেগ ও উচ্ছাস। বিশাল যা স্পৰ্শ করা যায় না কিন্তু অনুভব করা যায়। তাই, মন হলো মানুষের চেহারার আয়না। মন ও জীবন ওতপ্রোভাবে জড়িয়ে থাকে একে অপরের সাথে। কিন্তু আমরা কেনটাই দেখতে পাই না, আরও একটি চমৎকার ঘটনা ঘটে। মন খারাপ-ভালো অর্থাৎ আনন্দ-কষ্ট আমরা প্রথম যদি লক্ষ্য করি মানুষের চোখের দিকে। চোখ মনের ব্যারোমিটার কাটা উঠানামা করে উদাসভাবে তাকান মানে মন খারাপ। চোখ খুশির বার্তা বয়ে আনে তখন দৃষ্টি কক্ষকে উজ্জ্বল দেখায়। আজ পর্যন্ত মনের ওজন আকার আয়তন কত, আবিক্ষার হয়নি কিন্তু মানুষের চেহারায় কম বেশি প্রকাশ পায়, অনুভূতির মাধ্যমে আমরা অনুভব করি।

মনের ভাল-মন্দ মানুষের আচার-আচরণে প্রকাশ পায়। আমরা বলি মানুষটার মনের গভীরে কী ছিল তা জানব কি করে। এই গভীরতা না মাপা যায়, না ওজন করা যায়। কিন্তু আমরা ভালবাসা-মায়া-মহমতা, উদারতা এ সব শৰ্দ মনের সাথে সংযোজন করে থাকি। মন থেকে মানসিক কথার একটি মিল আছে। এখন প্রশ্ন হলো মনকে জীবন পরিচালনা করে, না জীবনকে মন পরিচালনা করে? জীবনের আনন্দ-বেদনা উজ্জ্বল সরলতা কৃটিলতা সম্পূর্ণভাবে মনের উপর প্রভাব ফেলে। আবার এও সত্ত্ব মনের আবেগ অনুভূতি জীবনকে সুন্দর কিংবা পংক্তিলতার দিকে ঠেলে দেয়।

বর্তমান প্রজন্ম আজকাল প্রায়ই বলে থাকে Upset, Depression ইত্যাদি। এর প্রধান কারণ পরিবারিক সম্পর্কের জটিলতা এবং একজন অপরজনকে না বোঝার জন্য, পরিবারের মূল্যায়ন, সম্মান, স্নেহ, ভালবাসা কেমন যেন যান্ত্রিক হয়ে যাওয়ায় কেহই কারোর সাথে সহজ হতে পারেন।

বর্তমান একক পরিবারে মা-বাবা উভয়ই ব্যক্ততার জন্য সন্তানকে

চলছে। সারাদিন সন্তানকে নিয়ে মা সংসার চাকরি নিয়ে ঝুঁত, পরিশেষে সন্তান যখন সমস্যা করে ফেলে তখন সব দোষ সেই নারীর যে প্রতিটি ঘৃহীত নিরলসভাবে দিয়েই যায় সন্তান বড় হলে। সেই মাও এক সময় বোৰা হয়ে পড়ে। এর সমাধান বিদেশে সন্তানে ২টা দিনের একটা ছুটির দিন ওরা পরিবার স্ত্রীকে দেয়। কথা, সমস্যা আদান-প্রদান করে। আমরা বিদেশী ভাল জিনিসটা নেই না। ছুটির দিন দেখা যায় হাজারে ১/২ পরিবারে মিলেমিশে সময় কাটায়। বাকি কিছু মানুষ নামে আছৃত প্রাণী ঘুমায়। নইলে ট্যাটার নামে পরিকিয়া করে বেড়ায় কিংবা ঝুঁতে তাস খেলে কাটায়। জীবনের ট্রেন যতই দ্রুতগতিতে চলুক কোন না কোন স্টেশনে থায়তে হবে। নইলে ক্যাসাবাকার ট্রেনের মত সময়ে পড়ে তলিয়ে যেতে হবে। জীবন দুটোর সমাধি, মন খারাপ থাকলে জীবন বোৰা হয়ে দাঁড়ায়, অসুস্থ হয়ে পড়ে। আচার-আচরণ খিটখিটে হয়ে যায়, ছবিরতা অমলোয়েগিতা এসে সাফল্যতা দূরে হারিয়ে যায়। জীবন দুর্বল হয়ে অসহায়হীন হয়ে পড়ে। তাই সময় থাকতে মন পরিচর্যার প্রয়োজন। সবশেষে আসুন উন্নয়ন করি হাতি দ বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে।



আমার লেখা / ১২

সুস্থ থাকার সহজ উপায়

আপনি ভাল আছেন? এর প্রতিউত্তর অনেককে বলতে শোনা যায় আর কোথায় ভাল থাকতে পারছি এই ব্যাথা সেই ব্যাথা বলে লম্বা কিরিত্ব নিয়ে বসবে। কিন্তু এর উত্তরে একটা যদি হেসে আমি বলি আজ্ঞাহীর রহমতে ভল আছি। কিংবা এইতো বেশ আছি। তবে ক্ষতি কি? অর্থাৎ মানবিকভাবে এবং পরিবেশগতভাবে ভাল থাকার এটা সহজ উপায়। কারণ যার যা অসুস্থতা তার জন্য ডাঙ্গার আছে তার কাছে মন খুলে সকল সমস্যা বলা বুক্ষিমানের কাজ।

বিজ্ঞ কার্যত দেখা যায় সেখানে নিজেই মোটামুটি ডাঙ্গার দেজে বিজ্ঞ ব্যক্তির ত ডাঙ্গারের কথা শেষ হওয়ার আগেই নিজে নিজের উত্তরে প্রেসতি ন করা শুরু হয়ে যায়। এই ইচ্ছাটা বাঙালিদের ভিতর প্রচলিত হল যা জানি তার প্রচারের চাইতে যা জানি না তার প্রচার বেশি ক

অ চিন্তা ধারায় একজন মানুষ সুস্থ থাকার সবচেয়ে সহজ উপায় হল মা ত বল এবং ইচ্ছাশক্তি। হাসি মানুষের সব গ্রানি-দুঃখ-কষ্ট দূর করে ত বৃত হবে “দুঃখকে এড়িয়ে চল, হাসিকে গ্রহণ কর”। আমাকে অনেকে একে করে আপনি সব সময় এত হাসি-খুশি থাকেন কি করে? আমি উত্তরে বলি মনকে সহজ-সরল রাখ, মানুষের জন্য ভাল চিন্তা কর, পরলে মানুষের উপকার কর নইলে চুপ থেকে অপকার জ্ঞানতা করা না।

যা হোক এত গেল মানবিক শান্তি। শারীরিক ও মানসিক দুঁটো একটি পূর্ণাঙ্গ সুস্থতার লক্ষণ। জরিপে দেখা গেছে মানুষ না খেয়ে যত না মনে অধিক খেয়ে তার চাইতে বেশি মনে কিংবা অসুস্থ হয়ে থাকে। যত বড় লোক তত কোলেস্টেরলের ভয়। আসল কথা যার যা দরকার সে তা করে না। যেমন ধনী ব্যক্তি যদি হয় তার সন্তানে সাত আটটি নিমজ্জন থাকে। ঠাণ্ডা ঘরে শীতল বাতাসে বসে ও শীতল গাঢ়িতে চলে ঘামে না। তার শরীরে যে বাড়তি ক্যালোরি সেটা ঘাম দিয়ে বের হতে পারে না। ফলফল কিছু দিনের ভিতর দেখা যায়, ভুঁড়ি, টাক, চোকের কেবলে থলি ইত্যাদি, উচ্চ রক্তচাপ, হৃদরোগ, বিশেষ করে বর্তমানে কম্পিউটার যুগে একটি শীতল বৃক্ষ ঘরে বসে বসে সমগ্র বিশ্বের কাজ করা যায়। সময় বাঁচে কিন্তু

আমার লেখা / ১৩

শরীরের পেশী, রক্ত সংগ্রালন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ইলেক্ট্রনিক রে চোখ নষ্ট হচ্ছে। তার অস্ততঃ সকাল-রাতে হাকা ভারী ব্যায়াম বয়স অনুযায়ী প্রয়োজন। ২৪ ঘণ্টার ভিত্তির ১টা ঘণ্টা যদি প্রাকৃতিক পরিবেশে জোরে হেঁটে আসেন তাতে মনে হয় বাকি তেইশ ঘণ্টা অনেক মূল্যবান হয়ে উঠে। এছাড়া নিজস্ব খোলা বারান্দা, ছাদে যদি হালকা এরোবিক করা যায় তাতেও সুস্থ থাকা যায়।

ভাল কথা, ভাল বই পড়া, ভাল চিন্তা করা, ভাল পরিবেশ, হাসি-খুশি, সহজ-সরলভাবে মানুষের সাথে মিশতে শেখা, অনের দৃঢ় শুনে নিজের দৃঢ় লাঘব করা, প্রতিদিন ছোট বড় যে কোন একটি ভাল কাজ করা, যেমন একজনকে হেসে জিজেস করা ভাল আছেন? এই হসিতে তার দৃঢ় কিছুটা লাঘব হয়। টেনশনের কোন ঔষুধ নেই এটাকে নিজ দায়িত্বে নিয়ে দিয়ে মিনিমাইজ করা, সত্যকে সত্য বলতে শেখা, মিথ্যাকে দেখা করা মানসিক শাস্তির উপায়। অনেক রোগী একে ডাক্তারকে সাহেব, ঔষুধ খাচ্ছি কৈ ভালত হচ্ছি না। পরীক্ষা করে দেখা আসলে কোন অসুখ নেই, পরশ্চীকাতরতা, হিংসা সবচেয়ে অসুখ। আসলে ভাল থাকা সম্পূর্ণ আল্পাহর উপর বিশ্বাস ও নিজে এবং মানসিক ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভর করে। তাই হাসুন করে ভাল থাকবেন।



আমার লেখা / ১৪

নারীর অবস্থান

নারীর অবস্থান কোথায়? এ পাশের উভয়ে প্রায় সকলেই একমত নারীর অবস্থান ১ম, ২য় ও ৩য় স্থানে। তবে অবস্থানের সাথে সাথে স্থানী-অস্থানী প্রশ্ন এসে যায়, অনেকে বলবেন কি ব্যাপার এটা কি চাকুরীর ক্ষেত্র নাকি?

না চাকুরী নয়, নারীর জীবন সর্বস্তরেই অস্থায়ী ব্যবস্থা। সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যবস্থায় কিছু নিয়ম যা ইচ্ছা অনিচ্ছায় মেনে নিতে হয়, যেমন হেট বেলা থেকে বিয়ের পূর্বে একরকম নিয়ম, দরজার কাছে কেন দাঢ়িয়ে ছিলে? জানালার পর্দা ঠিকমত টেনে দাও একা দিনেই হোক রাতেই হোক কোথাও যাবে না এমন কি বাড়ীর ছাদেও না। বলতে পারেন এ সমস্ত ঘটনা অনেক আগের। ঠিক আছে মেনে নিলাম। একা চলা নিরাপদ নয়। সুতরাং স্বাধীনতা চলবে না, বেশ বিয়ের পর স্বাধীন হবে তাই খুশী মনে বিয়ে করে বরের বাড়ী বা শুঙ্গর বাড়ি যেতে হয়। সেখানে খুব কম মেয়ের ভাগে বাবার বাড়ির চাইতে উদরতার আচরণ পাওয়া যায়। একটু দেরী যদি হয় ফিরতে তবেই হাজার প্রশ্ন সেটা কর্মক্ষেত্র থেকেই হোক কিংবা ছাত্রী হিসাবে শিক্ষাক্ষেত্র থেকেই হোক, এখনও মেয়েদের প্রধান দায়িত্বে রাত্তা, সংসার, বাচ্চা ও মেহমানদারী করা। আমি এগুলির বিরুদ্ধচারণ করছিনো তবে সকলে মিলে যদি উপরোক্ত কাজগুলি ভাগ করে নেওয়া হয় তবে কাজের কষ্ট না হয়ে আনন্দ হয় সেটা একবার কেহ ভাবে না। ব্যক্ত স্বামীর স্ত্রীর অবস্থা আরও করুণ। তিনি কখন যাবেন কখন ফিরবেন তার উপর নির্ভর করবে সেই মেয়ে চাকুরীজীবীই হোক বা ছাত্রীই হোক কিংবা গৃহিনীই হোক, তার মন পেতে হলে তার পছন্দই নিজের পছন্দ বলে অনেকটা মেনে নিতে হয়। সেই যেয়েটি যে বউ হয়ে আসল তার মন, ইচ্ছা, চেতনার দিকে কেহই নজর দিচ্ছে না। সংসারের বিশেষ কোন প্রয়োজনে যেমন সন্তানের অসুখ বা শুঙ্গ-শাস্তির অসুখ কিংবা মেহমান আসবে কর্মক্ষেত্র থেকে ছুটি নিতে হবে সেই নারী আর বেশীর ভাগ ছুটি দিবে পুরুষ এবং খুশী মনে নয় বরং ক্ষেত্র বিশেষে কটুভাবে হাড়ে ছাড়ে না। যেমন চাকুরী করেন কেন? বাড়ীতে রাঙ্গা-বাঙ্গা করেন ওটাই আমাদের জন্য ঠিক ইত্যাদি।

শুঙ্গের বাড়ীর অন্যান্য সদস্য অর্ধাং যৌথ পরিবার হলে দেখা যায় সুবোধ বাধ্য ছেলেটি অফিস থেকে ফিরে সকলের সমস্যা বা আনন্দের কথা শুনতে শুনতে বৌ এর কথা আর শোনা হয় না। একক পরিবার হলে অবশ্য কিছুটা অন্য রকম কিন্তু ব্যক্ত স্বামীর বউ মানে পুরো সংসারের কেয়ার

টেকার। সব ধরণের সমস্যা শেয়ার করার ইচ্ছে থাকলেও সময় দিতে পারে না অনেক স্বামী বউটির আমিত্তের স্বত্তার খৌজ খবর সে নিজেও নিতে পারে না। ভালে লাগা মন্দা লাগার পার্থক্য হারিয়ে যায়।

মধ্য বয়সে অনেক কম সংখ্যাক মহিলা নিজের মতন করে চলতে পারে। তখন স্বামী না থাকলে হাজার গার্জিয়ান, পরাধীনাতা সর্বস্তরে সর্বক্ষেত্রে ব্যক্ততা দেখালে বলা হয় সংসার থেকে ফাঁকি দিয়ে আনন্দ করা হচ্ছে মেয়েদের স্থান হল শূন্যস্থান পূরণ করা।

মেয়েদের স্বামী আবাস বা অবস্থান কোথাও নেই একথা সকলেই কম বেশী বিশ্বাস করি। কিশোরী থেকে মধ্য বয়স বিভিন্ন স্তরে একা চলা বা নিজের মত করে একা বসবাস সবটাই সামাজিক গ্রহণ যোগ্যতা তেমন একটা ভাল চোখে কেহই দেখে না। সব চাইতে আচর্য্য বিশয় হল বয়স ডেডে বিভিন্নস্তরে পিতা-মাতাও সর্বক্ষেত্রে সহযোগিতার হাত বাড়ায় না। বিশেষ পর স্বামীর সাথে ভাল বনিবান না হলে মা দোল নিজের কল্যাকেই, কারণ আবার তার ঘাড়েই যদি এসে উঠে।

আসলে নারীর অবস্থান টলমলে সব সহয়ই, স্বামী কে পদবী নেই। আকিকার নাম দিচ্ছে মা-বাবা। বিশেষ পর স্বামী জোরা দেওয়া হয় ডিভোর্স হলে সব নামের গৌরব চলে যায় নারী অমুকের মা হিসাবে সেখানে নিজের নাম অচল হয়ে যায়। তার্স হলে শুভর বাড়ী সদস্য হিসাবে গণ্য হয় না কারণ রাজের সম্পর্ক নেই। যতই দেহ-মন দেই না কেন। স্বামী হারা অবস্থান নারীর জন্য সব চাইতে কঠিন সমস্যা, একা থাকলে চরিত্রের কালিলোপন, কারণ সাথে থাকলে মাথা নিচু করে সব ধরণের ইচ্ছাকে গলটিপে তবে বাঁচতে হয়। সেই সন্তান মা কিনা করে সেই সন্তান যেমন তেমন অবহেলা হয় জীবন ধারণের বাধ্য করে।

কিছু ক্ষেত্রে সুন্দর সম্মানজন জীবন সর্বক্ষেত্রেই বহন করে তাদের সংখ্যা এতই কম পরিসংখ্যানে আনা যায় না। তারা সৌভাগ্যবংশী, আমাদের সকলের কিছু দায়ভার আছে এই বৈষম্য দূর করার বিশেষ পর কোন দুর্ঘটনা ঘটবে বাপের বাড়ীর সেই সুন্দর কক্ষটি যেন তারই বরাদ্দ থাকে অবহেলা না হয়। কিংবা স্বামীর মৃত্যুর পর সেই মর্যাদায় যেন শুভর বাড়ীতে আটু থাকে। ডিভোর্স মানে কোন সংক্রামক ব্যাধি নয় সকলে তুচ্ছ-তাত্ত্বিক করবে। নাম-ধার, পদবী, মর্যাদা আর অস্ত্রায়ী নয় মানুষ হিসাবে স্বামী হোক আদর, ভালবাসা, সেই ও মর্যাদা। এই হোক সকল নারীর অবস্থান।

“শিশুর জন্মের পূর্বে ও পরে সচেতনতা”

“সন্তান থাকুক দুধে ভাতে” একথা আমরা প্রায় সকলেই বলি, সন্তান আগমনে পরিবারে আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু সেই সন্তান ব্যবন অসুস্থিতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তখন সম্পূর্ণ পরিবারের কষ্ট-দুঃখ বিশেষ করে মা-বাবার কঠিন সীমা থাকে না।

ছেলে বা মেয়ে সন্তান হোক না বলে, সুস্থ সন্তান হোক এই দোয়া সকল গৰ্ভবতী মায়ের জন্য করা উচিত। প্রতিবন্ধী শিশু কেন হয় এখনও সম্পূর্ণভাবে মানুষের আয়তে আসে নি। তবে বিশেষ পূর্বে আমরা দেখি মেয়েটা সুন্দর কিনা বিভূতিবান কিনা ছেলেটি কি করে পদমর্যাদা করবানি ইত্যাদি। এর সাথে যদি রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা নেয়া যেত তাতে কিছুটা হলেও উপকার হত।

আর্টিস্টিক-আর্টিজম (Artism) সাধারণভাবে উদাসিনতা বৃক্ষায়। মেয়েদের তুলনায় ছেলে সন্তানদের সংখ্যা বেশি ছেলে ২: মেয়ে ১ (২:১)। কয়েকটি কারণ এখানে দিচ্ছি কি কারণে আর্টিজম হতে পারে।

- (১) ক্রোমোয়োমের ফ্রটিপূর্ণ বিন্যাস;
- (২) রক্তের সম্পর্কতার বিবাহ (চাচাত, মামাত, খালাত);
- (৩) স্বামী-স্ত্রীর R-H পজিটিভ ও নেগেটিভ হলে;
- (৪) Infection & Toxication;
- (৫) German measles;
- (৬) Trama-মানসিক চাপ;
- (৭) Malnutrition-অপুষ্টি;
- (৮) Family environment-পরিবেশিক পরিবেশ;
- (৯) Social and birth place change etc.

আমরা শিশুর জন্মের পর লক্ষ্য রাখি শিশুর স্বাভাবিক নড়াচড়া, শব্দ শুনে তাকান, কথা বলার চেষ্টা করা স্বাভাবিক আচরণ থেকে যদি সে আলাদা ভাব প্রকাশ করে যেমন-

- (১) স্নেহ জীন মনোভাব উদাসিন ভাব;
- (২) কোন আবেগ বা ক্ষোভ না থাকা;
- (৩) অস্বাভাবিক ধরণের কথা বলা যেমন যাত্রিক শব্দ;
- (৪) একই কাজ এবং একই শব্দ বারবার করা;

(৫) প্রাণহীন বস্ত্রের সঙ্গে সম্পর্ক আগ্রহী;

(৬) আলো, শব্দ, গন্ধ, স্বাদ, স্পর্শ প্রভৃতি অনাশঙ্কি;

(৭) আনন্দ, খুশি, আদর, ভালবাসার প্রতি উদাসিন।

ক্রমাগত উদ্দীপনা দান করে এদের মনোযোগ সামান্য বৃদ্ধি করা যায়।
বৈবাহিক সম্পর্কের পূর্বে যদি অভিভাবকগণ সচেতন হন তবে ভবিষ্যতে এ
ধরণের জন্মহাস করা যায়। একটি কথা মনে রাখতে হবে গর্ভাবস্থায় নারীর
যত্ন, মানসিক, শারীরিক ও খাদ্য ব্যবস্থার সচেতন ও আজ্ঞারীক হলে এই
পরিস্থিতি থেকে কিছুটা হলেও সংখ্যা কমে আসে শারীরিক ও মানসিক
গর্ভাবস্থায় অসম্ভব প্রতিক্রিয়া হয় যদি পারিবারিক নির্যাতন, অবহেলা, ছেলে
সন্তান হতেই হবে বলে মানসিক ভয়-কষ্ট দেওয়া থেকে বিরত থাকতে
হবে।

এরপরও যদি অজ্ঞান কারণে অনেক প্রতিবন্ধী সন্তান : আর্টিজম
শিশুর আগমন হতে পারে তখন সেই বাবা-মাকে আত্ম : পরিবারের
সদস্য এবং আশেপাশের স্বজন-বন্ধুদের দিতে হবে। তোমা : থে আমরা
আছি এই কারণে তোমার কোন দোষ নেই বুঝতে হবে। তোমা :
আঁড়ালে না রেখে মুক্ত পরিবেশে মিশতে দিতে হবে। মা-বা :
কোন কারণ নেই সব পরিস্থিতির সহজভাবে নিলে কষ্ট কিছু না



পরিবারের সঙ্গে ইদের আনন্দে আমি

শ্রদ্ধান্তঞ্জলি কবি বেগম সুফিয়া কামাল

'জন্মলে মরিতে হইবে
অমর কে কোথা করে
চিরস্থির কবে নীর
হায়রে জীবন নদে।'

এ কঠিন সত্য বিধান থেকে কারুর পরিত্রাপ নেই, তবুও আমরা চাইনা
আমাদের আপনজন, চেনামুখঞ্জলো ঐভাবে চিরতের হারিয়ে যাক, আরও
বেশী দুঃখ-কষ্ট হয় সেই হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তি যদি হন জাতির শক্তি,
সাহসের ও আনন্দের ধারক সেই শৃঙ্গস্থান আর পূর্ণ হয় না।

বেগম রোকেয়াকে বই, সভা, সমিতি, প্রতিষ্ঠান ও আলোচনার মাধ্যমে
অঙ্গা ও ভালবাসা দিয়ে বুঝেছি, জানতে পেরেছি, কিন্তু বেগম সুফিয়া
কামালকে আমরা সাঁকের মায়াও কবিতা, বেগম পত্রিকা এবং কচিকাচার
আসরে বাস্তবে দেখেছি ও অনুভব করেছি, আমাদের বেশী ভাল লেগেছে
সেদিন, যেদিন তিনি আমাদের উত্তরা লেডিজ ক্লাবে এসেছিলেন, সেদিন
সরাসরি তাঁর সাথে কথা বলার সুযোগ পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে করেছি।
বেগম সুফিয়া কামালের মত এত বড় মাপের ব্যক্তিত্বের সঙ্গ পাওয়া বিলম্ব।

মনে পড়ে যায় এই তো সেদিন (২০-২২) বছর পূর্বের ঘটনা,
আমাদের উত্তরা লেডিজ ক্লাবে এই বরেণ্য কবি মহিয়সী নারী বেগম সুফিয়া
কামালকে সংবর্ধনা দেওয়ার আয়োজন করা হল। তিনি তখন বয়সের ভারে
প্রায়ই অসুস্থ থাকতেন তবুও তিনি আমাদের নিরাশ করলেন না, কথা
দিলেন এবং তিনি আসলেন।

পড়স্ত বিকেলে আমরা ক্লাবের সব সদস্য ও আমাদের সন্তানরা সব
অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি কখন তিনি আসবেন, কখন নারীকুলের
গৌরব তাঁর পদধূলি পড়বে, আমরা আমাদের সাধ্যমত আয়োজন করেছি
তবুও মনে হচ্ছিল যেন আরও কিছু করা দরকার। সব কৌতুহলে অবসন
ষটিয়ে সাঁকের মায়ার কবি পড়স্ত বিকেলে পদার্পণ করলেন। অবাক হয়ে
দেখলাম হালকা-পাতলা ফর্সা-সদা হাস্যময়ী মাতৃত্বের পরশ বুলিয়ে

আমাদের উত্তরা লেডিজ ক্লাবের প্রাঙ্গণ আলোকিত করলেন, এই কি তিনি? কি বিশ্বয় লাগছে ভাবতে সেই অক্ষকার, পর্দা ও কুসংস্কার সমাজকে আলোর প্রতীক হয়ে উপস্থিত হয়েছেন, সেই যুগে যদি তিনি নিজেকে কুসংস্কার থেকে মুক্ত করতে না পারতেন তবে আজ আমাদের অবস্থান এ পর্যায় আসা কত কঠিন একথা ভাবতে পারিনা। নারী মুক্তির দীপ জ্বালিয়ে ছিলেন বলেই, আজ আমরা স্বাচ্ছন্দে ওনাকে সংবর্ধনা দিতে পারছি, সুষ্ঠু সুন্দর স্বাধীন জীবন উপভোগ করছি ৮৮ বছর! কতগুলি যুগ কত উত্থান-পতন, কত লড়াইয়ে তিনি প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ স্বাক্ষী ছিলেন ৫২ সনের ভাষা আনন্দোলনের সাথে যেমন সক্রিয় ছিলেন, বর্তমান প্রধান মন্ত্রী শেখ হাসিনা ৭১ সনে প্রথম সন্তান সন্তান সন্তান ছিলেন হাসপাতালে পাক-সেনারা কাউকে



আমাদের সন্তানেরা কবি সুফিয়া কামালের সাথে

তিতরে যেতে দিইছিলেন না, অসীম সাহসী নারী কালের পৌরুর তিনি মাঝের দেহ ও সাহসের সাথে হাসপাতালে ক্ষণিকের জন্য গিয়ে শেখ হাসিনাকে সাহস ও অভয় দিয়ে এসেছিলেন। এর ফলে তাঁকে কিছুটা সমস্যায় পড়তে হয়েছিল, কিন্তু তার কর্তব্য তাঁকে অটল রেখেছিল। এ শুধু ওনার সাহস ও মাঝা মমতার উপরেই সন্তুষ্ট হয়েছিল, তিনি অন্যায়কে কথনও প্রশ্ন দিতেন

না। প্রতিবাদী কবি সুফিয়া কামাল আরও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। একবার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বাঙালি ছাত্রদের অবমানকার উকি করায় তিনি সরাসরি প্রতিবাদ করেছিলেন, বলেছিলেন ‘বাঙালী ছাত্র গান্দার হলে আপনি গান্দার প্রেসিডেন্ট।’

এই অসীম সাহসী নারীর জন্মস্থান ছিল বরিশাল জেলায়। ১৯১১ সনে বরিশালে মাতৃসন্দনের কাজের মাধ্যমে তার সেবা কাজ শুরু হয়েছিল। এরপর কলকাতায় বেগম রোকেয়ার প্রতিষ্ঠিত “আঙ্গুমানে খাওয়াটাইন” প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে ভীষণ ভালবাসতেন। তিনি কবি সুফিয়া কামালের উদ্দেশ্যে কবিতা লিখেছিলেন। ১৯২৫ সালে অবিভক্ত ভারতে বৃত্তিশ বিরোধী অসহযোগ আনন্দোলনের সমর, সহাত্ত্য গাঁকী বরিশালে এসেছিলেন। সেই সময় কবি সুফিয়া কামাল চরকাড় তা কেটে গাঁকীজীর হাতে দিয়েছিলেন। ইতিয়ার উইমেন্স ফেডারেশনের মুসলিম মহিলা সদস্য হন তিনি। ১৯৫৪ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ওয়ারী সমিতি, ১৯৭০ সনে গঠন করেন মহিলা পরিষদ। সেই থেকে তিনি প্রতিষ্ঠাতা সভানেত্রী ছিলেন। শিশুদের তিনি ভীষণ আসতেন। সেই ছেষ্ট সোনা মনিদের জন্য কঢ়িকাচার আসর “সংগঠনে প্রতিয়ে ছিলেন। তিনি ছিলেন, সকলের আদরে ও ভীষণ কাছের “খালাচা” জাতির কাছে তার সম্মান ভাষ্য প্রকাশ করার মত নয়। আমরা সকলে তাঁকে দেখলাম, অন্তর করলাম। উত্তরা লেডিজ ক্লাবে আবার তাঁর মৃত্যু সংবাদ ওনলাম। আমরা ক্লাবের সকল সদস্য চমকে উঠলাম। মৃত্যু যতই কঠিন সত্য হোক মেনে নিতে ভীষণ কষ্ট হয়। আফসোস বাংলাভাষা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষার শীর্ণতি পেল তখন তিনি অনেক-অনেক দূরে। আনন্দের সংবাদ ওনে যেতে পারলেন না। তিনি নেই দৈহিকভাবে কিন্তু তিনি আছেন সকলের অন্তরে, প্রতিটি কাজে, প্রতিটি সুন্দর চিত্তায়। বাঙালি তাঁর কাছে চিরকৃতজ্ঞ।

একান্তরের স্মৃতি

৪৬ বছর হতে চলছে তবুও ২৫শে মার্চের কালরাত্রির কথা এক মুহূর্তের জন্য ভুলতে পারছিন। কি সাংঘাতিক ২৪শে মার্চ। কেমন এক রোমণ্ডকর অনুভূতি আমরা নাকি আবার স্বাধীন হচ্ছি। পাকিস্তানের আর অংশ বিশেষ নয়, আমরা পূর্ণাঙ্গ একটি স্বাধীন দেশ, জাতি এবং স্বাধীন স্বত্ত্বার অধিকারী হতে যাচ্ছি। তখন ছাত্রী ছিলাম, এত বেশী অভিজ্ঞতা বা যুদ্ধের বিভিষিকা সম্বন্ধে কোন আন্দাজ বা ধারণা ছিল না।



নিউইয়র্কের একটি স্বাস্থ্য আমি

আমার ভাই আঙ্গুল মান্নান যিনি জাতীয় শ্রমিক সীগের সাধারণ সম্পাদক ও লাল বাহিনীর নেতা ছিলেন। তার মুখ থেকে ন্যায়-অন্যায়, দেশের দেনা-পাওনা ইত্যাদি কথা শুনতাম আর ভাবতাম তাইতো ত্রিটিশ কলোনীর পর একই ধাঁচে বরং আরও তাছিল্য আমরা অবহেলিত হচ্ছি কেন? আমরা আমাদের ন্যায়-পাওনা থেকে বাধিত হই। ২৪শে মার্চ ভাইয়া এনে যখন বললেন আর আলাপ-আলোচনা ফলপ্রসূ হবে না তখনও ভাবিনি আমাদের ন্যায় দাবী আদায়ের মাসুল দিতে আমাদের এক সাগর রক্ত,

নারীর ইজত, যুবক-তরুণদের তাজা রক্ত বুদ্ধিজীবীদের আহত্যাগ এইভাবে সোনার বাংলাকে শৃঙ্খনে পরিণত করবে।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ সকালে আমাদের পুরাতন ঢাকা গোড়ারিয়া বাসায় যখন বাংলাদেশের পতাকা টাঙ্গান হল। সেকি আনন্দ-হাততালি দিয়ে ভেবেছিলাম বাহ: কি মজা স্বাধীন হয়ে গেলাম। এখনও ভাবলে শিহরিত হয়ে উঠি। পতাকা টাঙ্গানোর ঘণ্টা খানেক পরেইতে দ্বিম দ্বিম, গুড়ম-গুড়ম আওয়াজ। ভাইয়া তাড়াতাড়ি আমাদের ঘরে যেতে বলে নিজে চোখের পলকে কোথায় চলে গেলেন। আধা ঘণ্টা গোলাগুলি হওয়ার পর পাক-সেনারা আমাদের ঘরে প্রবেশ করে জানাল ওরা আমাদের ভাই সুতোং তয় পাওয়ার কিছুই নেই। কিছুক্ষণ আমরা সকলে হতবাক হয়ে বেবা দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম। শুধু মনে প্রশ্ন হতে লাগল কেন? কি অপরাধ? কি কৰে? এরপর ওরা আমাদের দুই ভাইকে মান্নান সন্দেহ করে নিয়ে গেল।

দিন পর হঠাৎ দেখি সেই ভাইয়া একদিন সকালে ফিরে আসল। ভূত খার মত সকলে চমকে উঠে ভাবলাম এও হয়? কারণ আমরা ধরেই যাছিলাম ওরা বেঁচে নেই। এতদিন বিভিন্নস্থানে আমরা বাসা বদলিয়ে যে ছিলাম। শুধু আমাদের কাজের লোক ঠিকানা জানত। ওদের চিক কাহিনী শুনতাম ভাইদের কাছে। একবাতে সেই ক্যান্টেন ওদের আবাসের পুরান বাসায় দিয়ে এসেছিল, সব আচ্ছাহর রহমত। তারপর দেশ ছাড়ল হল। কিন্তু প্রশ্ন জাগে মনে সফলতা কতটুকু? এখন বৈষম্য কার সাবে? স্বাধীনতা ভোগ করছিল সকলে। মজার ব্যাপার উক দু'টো পক্ষতি কিন্তু সরকার দ্বারা অনুমোদিত, তা হলে দেখা গেল মৌলবাদীরা একই দেশের আইন-কানুন না মেনে সরকারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নিজেদের পছন্দ ও সুবিধামত আইন প্রয়োগ করছে।

নারী উন্নয়ন ও নারী স্বাধীনতা শুধু দু'টো বাক্য নয়, এর আয়তন, পরিধি অনন্ত অসীম এটা ভুললে চলবে না। এর জন্য মানসিক, আর্থিক স্বাধীনতা ও সমষ্টিগত ঐক্যজোটের প্রয়োজন আছে, আত্মহত্যা না করে, যৌতুক না দিয়ে এবং না নিয়ে ধৈর্য, ভালোবাসা, সহানুভূতি ও প্রতিবাদের জন্য একজোট হতে হবে। বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইনগত ও সামাজিক ধিক্কার দিয়ে সেই পুরুষদের বিরুদ্ধে কৃষে দাঢ়াতে হবে। কিছুদিন পূর্বে টিভিতে যে “কৈতব” নাটক দেখিয়েছে তেমনি শুধু চোখের জল না ফেলে সমাজের সব নোংরা ব্যবস্থাকে পুড়িয়ে ফেলে প্রতিবাদ

করতে হবে। দেশ স্বাধীন হল আজ ৪৬ বছর কত বীর প্রতীক পেল পুরুষ
মহলের মুক্তিযোদ্ধা অখচ কি ভীষণ বিন্দুপ ও হাস্যকর অবস্থায় “তারামন”
মুক্তিযোদ্ধার স্বীকৃতি পেল, যখন তার ভগ্ন স্বাস্থ্য ও আর্থিক নির্যাতনে প্রাণ
বায় আর এই ধরণীতে থাকতে চাছে না তখন। কিন্তু কেন তারামন নারী
বলে? সেই তারামনের মত অশিক্ষিত নারীর কথা দিয়েই শেষ করছি যে,
“নারী দিবস” নয় নারী ধন দিবস অর্থাৎ নারীর ধন হল মর্যাদা ও সম্মান।
তাই তারামনের সুরে সুরে মিলিয়ে বলি অমূল্য নারী ধন যেন আর
অসম্ভানিত না হয়।



মাহা ও নিভেল এর সাথে আমি



আমরা তিন বোন

জীবন কেমন হওয়া উচিত

বর্ণ থেকে নদীর সৃষ্টি। তার আনন্দ আমরা নদীর উচ্ছলতা কলতানের
মধ্যে বুঝতে পারি। নদীর চেট নদীর জীবন প্রবাহের কথা জানিয়ে দিয়ে
যায়। মানুষের জীবন প্রবাহ তেমনি একটি শিশুর জয়ের আনন্দের মধ্য
থেকেই শুরু হয়। নদী ও জীবন প্রবাহের ভিতর অনেক মিল ঘূঁজে পাওয়া
যায়। নদীর সৃষ্টি বর্ণার উল্লাস ধৰনী বুঝিয়ে দেয়। বিভিন্ন দিকে ঝেকে
কখনও উত্তাল তরঙ্গ কখনও শীর্ষ হয়ে সাগরে মিশে যায়। মানুষ কখনও
গল্পচলে বলে এই যে বলি ধূঁ ধূঁ করছে এখান দিয়ে পদ্মা একদিন উত্তাল
তরঙ্গ দুকূল ভাসিয়ে নিত। কত নৌকা বহরা লঞ্চ এখান থেকে বেতে আজ
নার পদ্মার সেই রূপ নেই।



শাহিন ও মুকুল

তেমনি মানুষের জীবন প্রবাহে জন্ম-মৃত্যু শেষ কথা নয়। আমরা জানি
আমরা সকলেই এই পৃথিবীর মেহমান। আজ নয় কাল এই ময়াময় আনন্দ
বেদনার পৃথিবী থেকে বিদায় নিব, তবুও প্রতিদিন আমরা ঝুঁটে চলেছি
কিসের আশায়? আজ স্বপ্ন দেখছি আগামীকালের, আজ যে শিশু সেও

একদিন বৃক্ষ হবে আর আজ যে বৃক্ষ সে আজ কোন দিন ফিরে পাবে না তার শিতকাল, কৈশরের উচ্ছ্঵াস ঘৌষণের জয়বন্ধী। মানুষ যখন ছুটে চলে আগামীকালের দিকে সে তখন ভাবে না, প্রতিদিন তার আয়ু থেকে একটি করে চমৎকার স্বর্ণালী দিন নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি মানুষ ভীষণভাবে একা, তবুও মানুষ একত্রে সকলের পরমাত্মায় হতে চায়। বৰ্ষণা, ধিক্কার, অবহেলা কোন মানুষের কাম্য নয়।

চলার গতি কিন্তু কখনও একভাবে থাকে না। কখনও ভাল-মন্দ কখনও সুখ-দুঃখের কখনও উঞ্চান-পতনের আবার কখনও গৌরব গাঁথা। তবুও জীবনের প্রবাহ চলতেই থাকে না। এক সময় নদীর মত জীবনও শেষ হয়ে যায়। থেকে যায় তার কর্মশূণ্য, জস গাঁথা ফেলে আশা দিনগুলির স্মৃতি। কোন কিছুই যখন চিরস্মায়ী নয় তবে কেন এই হানাহানি? কেন মানুষে মানুষে ঘণ্টা ঘুক, বল প্রয়োগ, দেশ দখল? রাজা ঘুক্কে জয় করে ফিরে এসে আনন্দ করে আত্মশবাজী ফুটায়। কিন্তু যখন তাবে এত মানুষের রক্ত দিয়ে এ আমি কি করলাম তখন কিছুশের জন্য হলেও হতাশাপ্রস্তু হয়ে পরে।

এত বড় আমেরিকার ট্রেড সেন্টার টুইন টাওয়ারের ব্রহ্মসজ্জ্বল সার পৃথিবীর মানুষকে চমকে দিয়েছে কেন এত মানুষের হিংসা? কি লাভ হল এতগুলো নিরীহ মানুষকে মেরে ফেলে? ক্ষণিকের কৃত্যকার্য কি চিরস্মায়ী সুখ-আনন্দ দিতে পেরেছে? ভূজ নগরী নিমিশে ভূ-গর্ভে বিলীন হয়ে গেল তাহলে আমাদের ভাবা উচিং কেন আমরা আরও চাই-চাই করে চিৎকাৰ করছি। কারণ এক মুহূর্ত পরে আমি নিজেই থাকব কিনা কে জানে?

জীবনে চাওয়ার পাওয়ার যেমন শেষ নেই তেমনি অভাব-অভিযোগেরও শেষ নেই। মানুষ যদি জানত আগামীদিনের স্র্য সে আর দেখতে পাবে না তা হলে হয়ত এত অন্যায় অভ্যাচার, মারামারি, হানাহানি, অনেক সম্পদের স্তুপ গড়ে তুলত না। পিছনে ফিরে হঠাত ঝাঁক্তি অনুভব করে তখন আক্ষেপ করবে-তাইত কেন এত কষ্ট করলাম এত কিছুর প্রয়োজন ছিল না? হিসেব-নিকেস করে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া আর কিছুই থাকে না। তবে ভাল কাজের পরিমাণ যার বেশী থাকে তার কষ্ট-দুঃখ কম থাকে। পরশ্চাকাতরতা মানুষকে শুধু হতাশাপ্রস্তু করে না, নিঃসঙ্গও করে দেয়। নিঃসঙ্গ জীবন মানুষের সবচেয়ে বড় অভিশাপ। প্রতিটি কাজের ভিতরে যদি সুষ্ঠ, সুন্দর, মহসুস ও গৌরব থাকে সে কাজেই অংশীদার হওয়া উচিং, একা ভোগে কোন সুখ নেই, একটু ভাল ব্যবহার, একটু কৃতজ্ঞতাবোধ, একটু অমায়ীক হতে

ক্ষতি কি? এতে কোন কষ্ট বা খরচ লাগেনা। শুধু একটু ত্যাগ, সমবোতা ও ইসিমুখে কথা বলা কিংবা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়া তেমন কোন কঠিন কাজ নয়। প্রতিটি মানুষের ভীতির সমবোতা থাকা উচিং। আহা-আহকার এক সময় মানুষকে একা করে দেয়, সমবোতা মানুষ মানুষের কাছে টানে।



তিন কন্যা

এনে রাখতে হবে, যে নদীর চেউ ও প্রবাহ চমৎকার সেই নদীর পানি ততই শচ্ছ ও জঙ্গলমুক্ত। তার তীরে এসে মানুষ শান্তি-সুখ খুঁজে পায়। তেমন মানুষের জীবন ভাল কাজ, সামাজিক যাগ, মহসুস, সামাজিক সংগঠনে অবদান, সুখে-দুঃখে অংশীদার সেই জীবনের কাছে অন্য একটি মানুষ এসে শান্তি-সুখ পায়। অথবা সুখ দেয় না, কর্মে মানুষের পরিচয়। মরে গেলে এই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে চলে গেলে মানুষ যদি একে অন্যকে বলতে পারে “আহা বড় ভাল মানুষ ছিলেন” সেই জীবন সকলের কাম্য হওয়া উচিং। মহৎ কীর্তির সৃষ্টিরাচির ভাস্কর থাকে।

৮ই মার্চ

৮ই মার্চ কি শুধু একটি তারিখ? নাকি শুধুই একটি দিবস? হ্যা, ৮ই মার্চ একটি প্রত্যয়, শপথ ও সূর্যোদয় তবে একটি দিবসের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বছরের প্রতিটি দিনের আনন্দ, স্বাধীনতা ও নারী জাতির সম্মান এই ৮ই মার্চকে ঘিরে হয়। তাই এই বিশেষ তারিখ একটি বিশেষ মূল্য "আন্তর্জাতিক নারী দিবস" হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৮৫৭ থেকে ১৯৯৬ সাল বয়ে চলছে এই নারী স্বাধীনতার আন্দোলন, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন স্থানে নিউইয়র্কের পথ ধরে মেঝিকো, কোপেনহেগেন, নাইরোবী, কায়রো এবং বেইজিং পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে আমরা কি আমাদের নারী সমাজের মানবিক মূল্যবোধ, সামাজিক মর্যাদা, স্বাধীন সিদ্ধান্ত সম্মানজনক উপস্থিতি, বৈবাহিক মর্যাদা পেয়েছি?

তাই আমার মনে হয় শুধু একটি বিশেষ দিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে এবং একক চিন্তা-ভাবনাগুলি সহানুভূতি সহকারে সমষ্টিগতভাবে অন্তর্ভুক্ত করে সুসংগঠিতভাবে প্রতিবাদ করতে হবে। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, পুরুষ সমাজকে শক্ত চিহ্নিত করে কিংবা আমাদেরকে বাদ দিয়ে এগুতে হবে। বেগম রোকেয়ার মতে সমাজ একটি পূর্ণাঙ্গ শরীর, তার একটি পা যদি পুরুষ হয় তবে অবশ্যই আর একটি পা হবে নারী। তাই সুন্দর দ্রুত লহে এগিয়ে চলতে হলে দু'টো পা অর্থাৎ নারী-পুরুষ দু'জনার সমর্যাদা ও সমঅধিকার থাকতে হবে। নারী যে পেশায় থাকুক না কেন একই পেশায় পুরুষের সমআর্থিক মর্যাদা দিতে হবে, শিক্ষায়, সমঅধিকার থাকবে। শুধু ছেলেদের উচ্চ শিক্ষা বা ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার বানাবে আর মেয়ে হলে বিঘ্নের জন্য তৈরী করবে তা চরম অন্যায় হবে। শিক্ষার বিকল্প নেই। তাই সাধ্যমত নারী শিক্ষার বিত্তার ঘটাতে হবে। তবেই নারী উন্নয়নের সহায়ক হবে। আত্মর্যাদা একটি জাতীয় উন্নয়নের সোপান আর তা সৃষ্টি হয় আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা ও স্বাধীনতার সাথে সাথে। আর্থিক স্বাধীনতা ছাড়া নারী জাতির মুক্তি নেই। তালাক কথাটি কত সহজে আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে নারীর অসম্মান ও আত্মাধিকার ডেকে আনে। অথচ বিশেষ তাকিয়ে দেখি একই তালাক লেভী ডায়নার আর্থিক স্বাধীনতার ও মর্যাদার উপর কত বড় একটা চ্যালেঙ্গ হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি তালাক বলেই যে

নারীকে তার শারীরিক ও সামাজিক সম্মান হানীর ব্যাপার ঘটায় আর তিনি কোটি ডলার দিয়ে রানী ইলিজাবেথ পার পাচ্ছেন না লেভী ডায়নার হাত থেকে। আমাদের দেশে আইন শৃংখলা রক্ষাকারীদের হাতেই হচ্ছে ইয়াসমীনদের মতো অসহায় বিস্তারীদের সন্ত্রমহানী। তদোপরী আদের শাস্তি না দিয়ে সেই অসহায় নারী কিশোরীকেই সমাজের এক শ্রেণী মুখোশধারী নারী-দামি বিস্তবান লোকেরা কুলশীত পরিবেশে ভীত সন্ত্রম জীবন কঠাতে হয়। অথচ জনকঠের খবর (৮.৩.১৯৬ ইং) জাপানের কুল ছাত্রীকে ধর্ষণের দায়ে মার্কিন নৌ-বাহিনীর অফিসারের ৭ বছর জেল হয়েছে। রক্ষা পেল না আইনের কাছে এত শক্তিশালী দেশ মার্কিন দেশ দূর্ভূগ্য আমাদের। কারণ প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় লেজী এমনকি বেশ কিছু মহিলা মন্ত্রী থাকা সত্যেও আমাদের দেশ অথবা নূরজাহানদের মত বধুকে ফতোয়াবাজদের মনগড়া শাসন পদ্ধতিতে পাথর মেরে মেরে নে। কিন্তু উচ্চমহলে সরকারী পর্যায়ে তার কোন প্রতিবাদ-প্রতিকারণ কিছুই হল না। বেইন ট্রি হোটেলে ধর্ষণ ঘটনার কোন শাস্তি পেজ না



বয়েজেন্ট্য বোন ও তার মেয়ে

বরং উৎসাহিত হয়ে বনানীতে আবারও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি, এমন কি ছোট ৫ বছরের শিশুও রেহাই পাচ্ছে না। নারীর মর্যাদা নারীকেই দিতে

হবে। বৌ-শান্তি ননদের অথথা বাগড়া স্থানীকে মূল সমস্যা সমাধান করতে হবে। মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক সমীক্ষায় দেখা দিয়েছে নারী নির্যাতন হচ্ছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী অসম্মানজনক পদ্ধতি (৮.৩.৯৬ জনকষ্ঠ) অর্থাৎ পাথর মারা, আগুনে পুড়িয়ে, গ্রাম্য বানোয়াট সালিশিতে জোর করে চরিত্রের কলঙ্কলেপন করে এমন কি ঝাড়-জুতা পেটা করে, (১৯৯৩-১৯৯৫) সনের ৪৩টি ফতোয়াজারী করে মৌলবাদীরা যে নারী নির্যাতন করেছে তার কারণ ছিল, সেই নারী পদ্ধতি জন্য নিয়ন্ত্রণ হ্রাস করছে এবং গ্রামীণ ব্যাংক থেকে ঝণ নিয়ে হাঁস-মুরগী পালন করে আর্থিক স্বাধীনতা ভোগ করছিল। মজার ব্যাপার উজ্জ দু'টো পদ্ধতি কিন্তু সরকার দ্বারা অনুমোদিত। তা হলে দেখা গেল মৌলবাদীরা একই দেশের আইন-কানুন না মেনে সরকারকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে নিজেদের পছন্দ ও সুবিধামত আইন প্রয়োগ করছে।

নারী উন্নয়ন ও নারী স্বাধীনতা শুধু দু'টো বাক্য নয়, এর আয়তন পরিধি অনন্ত অসীম এটা ভুললে চলবে না। এর জন্য মানসিক, আর্থিক স্বাধীনতা ও সমষ্টিগত ঐক্যজোটের প্রয়োজন আছে, আভ্যন্তর্য না করে, যৌতুক না দিয়ে এবং না নিয়ে ধৈর্য, ভালোবাসা, সহানুভূতি ও প্রতিবাদের জন্য একজোট হতে হবে। বছুবিবাহ, বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আইনগত ও সামাজিক ধিক্কার দিয়ে সেই পুরুষের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে হবে। কিছুদিন পুরো টিভিতে যে “কৈতব” নাটক দেখিয়েছে তেমনি শুধু চোখের জল না ফেলে সমাজের সব নোংরা ব্যবস্থাকে পুড়িয়ে ফেলে প্রতিবাদ করতে হবে। দেশ স্বাধীন হল আজ ২৫ বছর কত বীর প্রতীক পেল পুরুষ মহলের মুক্তি যোদ্ধা অথচ কি ভীমণ বিদ্রূপ ও হাস্যকর অবস্থায় “তারামন” মৃত্যুযোদ্ধার স্থীরূপিলে, যখন তার ভগ্ন স্বাস্থ্য ও আর্থিক নির্যাতনে প্রাণ বাহু আর এই ধরণীতে থাকতে চাচ্ছে না তখন। কিন্তু কেন তারামন নারী বলে? সেই তারামনের মত অশিক্ষিত নারীর কথা দিয়েই শেষ করছি যে, “নারী দিবস” নয় নারী “ধন দিবস” অর্থাৎ নারীর ধন হল “মর্যাদা ও সম্মান”。 তাই তারামনের সুরে সুর মিলিয়ে বলি অমূল্য নারী ধন যেন আর অসম্মানিত না হয়।

সামাজিক অবক্ষয় আজ কোন পর্যায়’

অবক্ষয় কথাটি অনেক সাধারণ শব্দ হয়ে আমাদের সম্মুখে প্রশ্নের সম্মুখিন। আমরা সকলেই উপরোক্ত শব্দটি সাথে কমবেশি পরিচিত।

আশ্চর্যের ব্যাপার হল এটা বর্তমান ডিজিটাল যুগে কোন পর্যায় এনে দাঁড়িয়েছে এটা নিয়ে আমরা অনেকেই খেয়াল করছিন।



আমার মেরে ও নাতনী

প্রথম পর্যায় ছিল সন্তানরা দিক ভেষ্ট হয়ে কিছু অনৈতিক ও অসামাজিক কাজ করত; আমরা যারা সমাজের একটু সচেতন তারা এটা প্রতিরোধ করার কথা বললে হয়ত কিছুটা হলেও সচেতনতা আসত। এরপর তরু হল বড় আকারে অর্থাৎ তখন বলা হতো, “এ যুগের ছেলে-মেয়েরা আদাপ-কাইদা মানেনা; আদাপ সালাম দেয় না, তারপর হল সংযবক্ষ হয়ে নেসাত্তহ ধর্মণ, হত্যা, বকু হয়ে বকুকে টাকার জন্য গুম-খুন, এসিড নিক্ষেপ, ছিনতাই আরও কিছু কিছু আইন প্রয়োগ। কিছু সচেতন মানুষ রাখে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ-বুঝান ইত্যাদি করে আঁড়াল করে অল্প-বিস্তর কমান হল।

ধীরে ধীরে এর রূপ পরিবর্তন হয়ে অবিশ্বাস্য রূপ ধারণ করল। ধর্মের দোহাই দিয়ে হলি আটিসিয়ান ঘটনার মত ভয়ঙ্কর কাও ঘটল, যা কিনা '৭১

রাজাকারদের ও পাকিস্তানি মিলিসিয়া বাহিনিকেও হার মানাল। এত গেল বাইরের অঙ্গনে, এই সন্তানদের বাবা-মার কষ্ট কতটা তা কি আমরা কখনও লক্ষ্য করেছি? ক্লাসিটিক স্কুলের টিচারের সন্তানের বাবা আপেক্ষ করে বলেন, “আমি কত সন্তান মানুষ করলাম আর আমার নিজের সন্তান আঁড়ালে-অগোচরে এত বড় সজ্জাসি হলো কখন আমি জানলাম না”।

তাই ভাবছি এ কার দোষ! হয়ত আমরাই দোষী, কারণ আমরা এ দায়ভার এড়াতে পারি না কোনাক্ষরে। কারণ সন্তানদের সেখাতে না পারার লজ্জা কিছুটা কমবে যদি এখানেই ওয় প্রজন্ম অর্থাৎ সকলের নাতি-নাতনীদের সাথে বক্তৃ-সত্যতা নিয়ে ধীরে ধীরে ওদের মনে একটু স্থান করে নিতে পারি। আমি সত্য ঘটনা ভাল জানি কিন্তু পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে প্রবাহিত করতে না পারি এক সময় এই সত্যতা-সাক্ষী ইতিহাস, সম্মানবোধ মানবিকতা সবই অক্ষকার ক্লে নিঃশেষ হবে। তখন আঙ্গৈপ করে লাভ হবে না। আজ ঘরে ঘরে একটি জিনিস খুব প্রচলন কেহ কার কথা শুনতে চায়না সবাই একে অন্যকে এড়িয়ে চলি। সন্তান মাকে, স্বামী স্থাকে এবং স্ত্রী-স্বামীকে সকলেই ভাবে আমিই ঠিক কেহ কাউকে কিছু জানাতে চায় না। অনেক সময় ঘরের ঘরের পরের কাছ থেকে তবে আত্মর্মাদা কতটা অপমান লাগে তা কিন্তু উপলক্ষ করি না।



আমার ছিয় মেজো ভাই কবির ও ফারকদা

সবচেয়ে অবক্ষয়ের ভয়কর দিকটা হল বর্তমানে মা-বাবাকে সন্তানদের মূল্য না দেওয়াই শুধু না, চোক রাঙ্গিয়ে নিজেদের দোষ ত্রুটি ভুলকে আঁড়াল করা, মিথ্যাকে সত্যতায় প্রমাণিত করা। সেদিন একটি অনুষ্ঠানে এক মহিলার সাথে অনেকদিন পর দেখা হওয়ায় জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় ছিলেন অনেকদিন দেখিনি। উনার উপর ওনে আমি হতবাক, তখনই মনে হল আর দেরি নয় এই প্রজন্মকে রক্ষা করা এখনই উপযুক্ত সময়। তার স্বামী হঠাতে করে মারা যান, সন্তানরা কিছুদিনের মধ্যে সহায়-সম্পত্তির মালিকানার হৃষি দিয়ে ওনার ঘর থেকে ওনাকে বের করে দেয়। সন্তানদের পারেননি কিন্তু তাদের সন্তানদের নিশ্চয়ই পারব, তাই কিছু করণীয় আলোচনা করছি-



চাকা উইমেস কলেজের স্ত্রী

- ১। বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস গল্পের মাধ্যমে তুলে ধরণ। ধীর মুক্তিযোদ্ধার মানুষদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করে তাদের মুখ দিয়ে সেই ভয়কর দিনগুলির কথা শুনানোর চেষ্টা, বিভিন্ন স্কুল, সংগঠন ও সংস্থা এর আয়োজন করা।
- ২। বায়জিজ্বল বৌদ্ধামীর মাকে পানি খাওয়ার গল্প।
- ৩। নবীজির আমানত নিয়ে ২/৩ দিন একই স্থানে অপেক্ষা করা।

বুড়ীমার রাস্তায় কাটা ফেলার পর তিনি তাকে দেখতে যাওয়ার গন্ত।

৪। মাদার তেরেসার মানুষের প্রতি ভালোবাসার গন্ত।

৫। ফ্লেরেল নাইটিপেল এর সেবার গন্ত। বাদ দিতে হবে ভয়ঙ্কর ত্রিল, নৃসংশ গন্ত। আমরা ছেট বেলায় হাতের লেখা লিখতাম “বড়দের সম্মান করা, সদা সত্য কথা বলি” এইগুলো আবার প্রচলন করা।

“গরীব-দুর্ঘটনার সাহায্য করা” দেখা হলো একে অপরকে সালাম দেওয়া, অর্থাৎ ডিজিটাল যুগে যতই আমরা দ্রুত আশ্রুনিকতায় এগিয়ে যাচ্ছি তার সাথে সাথে “নিয়মানুবর্তীতায়” ততই পিছিয়ে যাচ্ছি। কারণ আমাদের সময় বাবা-মা ছাড়া বড় আত্মীয়সজ্ঞন পাঢ়া-প্রতিবেশীর গুরুজ্ঞন সকলে সকলের অভিভাবক ছিলেন এটাই অলিখিত নিয়ম ছিল। তাই সন্তানদের সারাঙ্গণ বাবা-মায়ের মুখোমুখি হতে হত না এবং বিরক্তীর কারণ হতে হতো না। শিক্ষকদের ভিতর আন্তরীকতা-নৈতিকতা ছিল অনেক তাই তাদেরও সম্মান ছিল অনেক।



ঢাকা উইমেল কলেজের স্মৃতি

বর্তমানে আমাদের অবস্থা কেউ কাউকে কেন যেন সহ্য করতে পারিনা, ব্যক্তিত্বে এত অমিল যে কেহ নিজের স্থান থেকে বিন্দুমাত্র সরতে রাজিনা,

আমার লেখা /৩৪

ফলাফল প্রতিটি মৃত্তে সংঘাত এড়ান যেন অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। এখনও মহিলাদের এত জবাবদিহিতা যেমন-কোথায় যাচ্ছে? কবন আসবে? কেন যাচ্ছে? ইত্যাদি নৈমিত্তিক ব্যাপার কিষ্ট পুরষ্টির একদম উল্লেখ সাতখন মাপ। এই তফাতে সম্মানবোধে আত্মসম্মানের ক্ষরণ হয়, শুধু তাই নয় পরবর্তীতে সন্তানরাও ভাবে ‘মা’ শুধু ঘরের সকলকে দেখাওনা করার কাজে নিয়োজিত থাকবে, তার আবার নিজস্বতা বা ভালুলাগার মূল্য কি? যে মহিলা চাকরী করে সংসার সামলিয়ে নিজেকে উজাড় করে দিল তার আগে বাড়ির গাড়ীটা সবচেয়ে শেষের অধিকার। দেশ স্বাধীন হয়েছিল এই অসমবন্টনের জন্য? নারী স্বাধীন হবে কি করে যতদিন সে মানুষ হিসাবে মর্মাদা না পাবে। তারপরও আমি আশাবাদী, কবির ভাষায় “জগতে যা কিছু সুন্দর অর্ধেক তা নারীর অর্ধেক তার নর” ভাষায় বা কবিতায় নয় বাস্তবে তা’ সুল্যায়ন প্রয়োজন। ফিরে আসুক মা ও নারী জাতীর সম্মান মানুষের প্রতি মানুষের দায়িত্ব ও সম্মানবোধ জগত থেকে সুন্দর হোক এ ধরণী, পাপ ও পক্ষিল মুক্ত হোক, ধরা জীবন হোক আনন্দ ময় ও অর্থবোধ্য।

কথায় আছে “সংসার সুখের হয় রমনীর গুণে” আমি তার সাথে কয়েকটি লাইন যোগ দিয়ে বলতে চাই যদি থাকে “গৃহবান পতি তার সনে”। সন্তানের প্রতি মায়ের যে, “Uncondition Love” সেটার প্রতিদান নয় গুণ থেকে মায়ের প্রতি নারী জাতির প্রতি সম্মান, ভালবাসা তাদেরও দেখান উচিৎ। প্রতিটি কাজের মধ্যে ব্যবহারের বাবা আচর-আচরণের মধ্যে, তাদের মনে রাখা উচিৎ আজ যেখানে যে অবস্থানে দাঁড়িয়ে সে যেই ধরণের ব্যবহার, আচরণ করার আগামিতে তার সন্তান ঠিক তাই করবে। “এই দিনে নিয়ে যাবে সেই দিনের কাছে” তখন আর সময় থাকবে না ভুল শোধরানোর কারণ বাস্তব বড়ই কঠিন এবং কঢ়। তাই সকলের প্রতি আহ্বান চলুন আবাল-বৃক্ষ-বণীতা হাত ধরে জীবনের চলার পথে মসৃণ ও সুন্দর সুখের করি।

আমার লেখা / ৩৫

নারীর অবস্থান কোথায়?

“সারা পৃথিবী আমার যুক্ত ক্ষেত্র”, কথাটি বর্তমান নারী সমাজের জন্য ভীষণভাবে প্রযোজ্য কিন্তু কিছুদিন ধরে আমার মাঝায় ঘূরছে সেই যুক্তের ফলাফল কি? উন্নতি না অবক্ষয়? নারী স্বাধীনতা, প্রগতি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছে? বিভিন্ন মিটিং সেমিনার আমাদের কি দিতে পারছে?

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশসহ আমাদের দেশেও প্রধানমন্ত্রী মহিলা। এ অবশ্য গর্বের কথা। এ ছাড়াও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ উচ্চাসনে মহিলা অধিষ্ঠিত আছেন এবং অবশ্যই কৃতিত্বের পরিচয় দিচ্ছেন। কিছুদিন হয় “দুরদর্শন” দেখলাম, মাদ্রাজের একটি পেট্রোল পাম্পে সব মহিলা কর্মচারী এবং সকলেই তাদের কাজের প্রশংসা করছেন। আমাদের দেশেও গার্লেন্টস থেকে ইটভাঙ্গা এমনকি দৈনিক শ্রমিক হিসাবে আজকাল মহিলাদের করতে দেখা যায়। ১৯৬৩ সনে ভেলান্তিনা তেরেসকোভার নভোজান পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা যেমন শিহরগম্ভুক ঘটনা তেমনি রসূলের আমেনা, মা ফাতেমা, রাজিয়া সুলতানা, ইন্দিরা গান্ধী, মার্গারেট মাদার তেরেসা ও ফ্রেরেস নাইটিসেল সকলেরই ক্ষেত্রে



মেয়ের শুভ্র-শাশ্বতীর সাথে -আমরা দু'জন
আমার লেখা / ৩৬

প্রচুর অবদান আছে ও সম্মান ও খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। আমাদের দেশেও নারী শিক্ষার অগ্রদৃত বেগম রোকেয়া, ফজিলাতুন্নেসা বর্তমান প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়া সকলেই নানা ঘাত-প্রতিঘাতকে জয় করে মানুষের মনের মনি কোঠায় স্থান নিয়েছেন। কিন্তু এত কিছুর উন্নতির পর কি মনে হয় না, কোথায় একটা অবক্ষয় প্রৎস নেমেছে।

আমার মনে হয় এই অবক্ষয়ের জন্য পুরুষ যতটা দায়ী, ক্ষেত্র বিশেষ নারীরাও কম দায়ী না। যত মারাত্মক দুর্ঘটনা, হত্যা প্রায় বেশির ভাগের পিছনে দেখা যায় পরকীয়া প্রেম কাজ করছে। কারণ নীমা হত্যা, চম্পা হত্যা, ডালিয়ার অপমৃত্যু। পুরুষ মেজিস্ট্রের দ্বারা মহিলা মেজিস্ট্রে নিহত এসব কয়টি। এছাড়া আরও হাজার ঘটনার পিছনে আমরা দেখতে পাই নারীর শক্ত হিসেবে নারী দায়ী। সেক্ষেত্রে পুরুষ দায়ী কিন্তু বেশীভাগেই মাধ্যম হিসাবে। বেনজীর ভুট্টোর প্রতি তার মায়ের সরাসরি আক্রমণ কি প্রমাণ করছে হিংসা, বিষের মানুষকে কোথায় নামিয়ে দিতে পারে। নইলে কোন সন্তানকে কোন যা তার ক্ষতির ক্ষমতির ভয়ে বাবার নাম বা পদবী ধারণ করতে বারণ করে? অথচ যার জন্য এই রেষারেশ সেই মুর্তজা ভুট্টো কিন্তু নীরব। নারী এক্যাজেট হয়ে এই সর্বনাশ অবক্ষয়ের রোধ করে সত্যিকারের দোষীকে উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে পৃথিবীকে সুন্দর করে তুলতে পারে ও সম্যসার সমাধান করতে পারে। পারে শাস্তি ও উন্নতি করতে। নারী তার কন্যা শিশুকে রক্ষা করতে পারল না-ইতেফাকের খবর-জনৈক পিতা তার পক্ষে সন্তান কন্যা হওয়ায় নদীতে নিষ্কেপ করেছে এবং বৌকে তালাক দিয়েছে। সেই লোকের মায়ের চিন্তা, “এত মাইয়া দিয়া কি করমু।” পুরুষ দায়ী এ ঘটনার জন্য যেমন সত্যি কিন্তু তাকে প্ররোচনা কে দিচ্ছে সেও এক নারী। এই শিহরগম্ভুক পৈশাচিক ঘটনার জন্য সত্যিকার অর্থে দায়ী কে? Xy ক্রমোজন বহন করে পুরুষ নারী ধারণ করে XX ক্রমোজন এটা বৈজ্ঞানিক তথ্য। একটি পুত্র সন্তান জন্ম হতে XY প্রয়োজন। নারী "Y" ক্রমোজম বহন করে না অথচ তাকেই দায়ী করা হয় কন্যা সন্তান হওয়ার জন্য। পুরুষ XY বহন করে সে X দিলে নারীর X যোগ হয়ে XX হয়ে কন্যা হয়। আর পুরুষ যদি "Y" ক্রমোজম দেয় তবে XY হয়ে ছেলে হয়। আমাদের দেশে সর্বক্ষেত্রে দেখা যায় পুত্র সন্তান না হলে মাকেই গঞ্জনা সহিতে হয় অথচ এই বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় কিন্তু সম্পূর্ণ দায়ী পুরুষ। আরও মজার ব্যাপার সেই গঞ্জনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে নারী কথনও কথনও শাশ্বত্তি রূপে নন্দন রূপে। বর্তমানে ধারাবাহিক ঐতিহাসিক নাটক “টিপু সুলতান” হায়দার আলীকে দ্বিতীয় বিবাহ

করান হল পৃত্র সন্তানের জন্য। আরও মজার ব্যাপার সেখানেও তার “মা”
মৃদ্য ভূমিকা পালন করেছেন তিনিও নারী।



নারী সংস্থা কর্তৃক রোহিণীদের মধ্যে কম্বল বিতরণের জন্য আলোচনা

এত প্রগতিশীল দেশ আমেরিকা অথচ আজ পর্যন্ত দেশ প্রধান নির্বাচনে
কোন মহিলা আসতে পারেনি। এমনকি মহিলা পাইলট প্রেন চালাবে
কথা আগে শুনলে সেই ফ্লাইটের অর্থেক যাত্রী যাওয়া ক্যানসেল করে এবং
দেখা গিয়েছে মহিলার সংখ্যা অধিক নারীর প্রতি আস্তা, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ও
সহানৃতির অভাবের ফলেই কিন্তু এই অবক্ষয়ের জন্য। আমাদের মনে
প্রাণে একজন নারীর প্রাপ্য সম্মান ও কৃতিত্বের প্রশংসা করতে হবে তবেই
উন্নতি, অবক্ষয়রোধ হবে। নারী এক্যুজেট পুরুষের পদঞ্চলন রোধ করতে
হবে। নিজেদের ভিতর মানসিক কোন্দল কমাতে হবে। তবে আমাদের
অবস্থান হবে উর্কে ও সম্মানজনক স্থানে। মনে রাখতে হবে রাসুল নবী
করিম (সঃ) বলেছেন, প্রথম তিনধাপ সম্মান নারীর, আরও মনে রাখতে
হবে একটি নারীই জন্য দেয় একটি পুরুষকে। সুতরাং তাকে হেয় করা যায়
না, করা উচিত নয়। আমাদের অবক্ষয় রোধ করে উন্নতি এবং স্বার্গীয়
ফলুধারা বইয়ে দেওয়া যায় তখন, যখন আমরা সকল নারী মানসিকভাবে
এক্যুজেট হব, সকলের প্রতি সকলে সরল, সহজ, সহানৃতিশীল ও
শ্রদ্ধারোধ রাখতে পারবো।

সম্পর্ক

সম্পর্ক বিষয়ে কিছু লেখার ইচ্ছা বছ দিন ধরেই মনে মনে পুষ্টিলাম।
মানুষে মানুষে কী ধরণে সম্পর্ক শুরু-শেষ, গভীর-হাঙ্কা-আলগা ইত্যাদি
বিভিন্ন ধরনের হয়, তা নিয়েই ভাবছিলাম।

সম্পর্ক কত দিন, কত গভীর-সেটা যেমন নির্ণয় করা কষ্টকর, তেমনি
কত বছর-দীর্ঘ সময় পার হয়ে সম্পর্ক থেকে যায় বাপসা-ফিকে। বাহ্যিক
দৃষ্টিতে কিছু সম্পর্ক থেকে যায় যা সাংঘাতিক রোমান্টিক ও আন্তরিক। কিন্তু
কিছুদিন মেলামেশার পর দেখা যায় অত্যন্ত কষ্ট অপমানজনক সম্পর্ক
টেনেছিচড়ে বয়ে বেড়াচে যুগ-যুগ ধরে। স্থায়ী-অস্থায়ী সম্পর্ক নির্ভর করে
টো মানুষ ও পরিবারের অন্য সদস্যদের আচার-আচরণের মাধ্যমে। অঙ্গ-
শিকের চলার পথে দেখা বা একত্রে থাকায় মানুষের অন্তর ছুঁয়ে যায়,
যাতো জীবনে আর দেখা হয় না কিন্তু অবসর মৃহূর্তে কিছুক্ষণের জন্য
হলেও মন আনন্দে ভরে ওঠে। আবার উল্টাটাও হতে পারে। কিছু সৃষ্টি
মানুষের আজীবন কষ্ট দেয়। অর্থাত্বে সম্পর্ক যতই স্থায়ী হোক না কেন এর
কোন নাম দেয়া যায় না। পাশাপাশি স্বামী-স্ত্রী বসবাস করছে যুগ-যুগ ধরে।
অভ্যাসবস্ত সব ধরনের কাজ-আচরণ চলে কিন্তু মনের গভীরে প্রবেশ
করতে পারে না। অথচ কর্মসূলে কিংবা পড়াগত বা সাংগঠনিক পর্যায়ে
এমন কিছু সম্পর্ক সৃষ্টি হয়, যার জন্য মন অস্থির থাকে। ভালোলাগা
অভিযান সৃষ্টি হয়-সেটাকেই সম্পর্কের গভীরতা বলে। কোন সম্পর্ক সৃষ্টি
লোক দেখানো বা কোন সম্পর্ক সত্যিকারে গভির আত্মা ছুঁয়ে যায়, তা
নির্ণয় করা বেশ কঠিন। মানসিক ও শারীরিকভাবে আনন্দ বয়ে আনে এমন
সম্পর্ক সত্যি অনেক বিরল। সম্পর্ক কত প্রকার:

- ১। রক্তের সম্পর্ক
- ২। সামাজিক ও ধর্মীয় বন্ধনে বৈবাহিক সম্পর্ক
- ৩। বন্ধুত্বের মাধ্যমে সম্পর্ক
- ৪। দৈহিক মানসিক সম্পর্ক
- ৫। পারিবারিক সম্পর্ক
- ৬। বৈধ ও অবৈধ সম্পর্ক
- ৭। জাতি ও দেশ ভেদে সম্পর্ক

৮। লৌকিকতা বা টানাপড়েন সম্পর্ক

৯। নিঃস্বার্থ সম্পর্ক ইত্যাদি

নিয়ে আমি দু'একটি সম্পর্ক নিয়ে একটু আলোচনা করছি। রক্তের সম্পর্ক: পৃথিবীতে অর্থবহ ও অটুট সম্পর্ক হচ্ছে রক্তের সম্পর্ক। পিতা+মাতা+সন্তান, ভাই-বোন, চাচা, ফুপু, মামা, খালা, ভাণ্ডে, ভাতিজা ইত্যাদি যত বাধা-বিপন্নি, অশান্তি ও কষ্ট-নিষ্ঠুরতার মধ্যেও এ সম্পর্কের নাম বা গভীরতা কমে না। হাজার বাগড়াঝাটির পরও দেখা যায় আবার তাদের কোনো বিপদে একজন অন্যজনের জন্য ঝাঁফিয়ে পড়ছে। মারামারি লাঠালাঠির পরও সম্পর্কের কোন চির ধরে না। জন্মান্তর-জন্মান্তরে রক্তের সম্পর্ক শেষ হয় না। রক্তের সম্পর্ক কোনো দিন শেষ হয় না।



মিরান ও খোকন

বৈবাহিক সামাজিক সম্পর্ক

বৈবাহিক সম্পর্ক হচ্ছে সবচেয়ে অটুট অথবা নাজুক সম্পর্ক। শারীরিক ও মানসিক সমন্বয়ে এই সম্পর্কের উৎপত্তি। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক বেশির ভাগ কেউই কাউকে চেনে না, সামাজিক এবং ধর্মীয় কিছু আইনের নীতিমালার ওপর এই সম্পর্কের সৃষ্টি হয়, ছকা না হলে গোল্প। বেশির ভাগ মানুষ এই সম্পর্ককে নিয়তি বা কপাল বা ভাগ্যের লিখন নামে আখ্যায়িত করে। এই

সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে সবচেয়ে প্রয়োজন সহ্যশক্তি। দু'টি প্রাণী ভিন্ন দেশ, পরিবার, মন-মানসিকতা ভিন্ন। আচার-আচরণ ও সাংস্কৃতিক চিন্তাধারায় ভিন্নতা থাকে। একই পরিবারের আপন ভাইবোন সকলের মন-মানসিকতা এক হয় না, বড় হলে ভিন্নতা বড় আকার ধরণ করে। আমরা তখন ব্যক্তিতে প্রকাশ বলি। কিন্তু ভিন্নতা সর্বক্ষেত্রে থাকা সত্ত্বেও কেউ কেউ আমরা টিকে যাই। বলি ভালোই আছি। কেউ বলি ভীষণ ভালো আছি, কেউ দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলি এ এক অস্তুত সম্পর্ক মন-প্রাণ সব দিয়েও তাকে আপন করতে পারলাম না সুবী হতে। কেউ জলভরা ঢোকে কাঁপা-কাঁপা ঠোঁটে বলে পারলাম না। অচেনা দু'টো মানুষ যাও বা কোনো রকম টেনেছিচড়ে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখছে সমাজ ও পরিবারের সম্মান চিন্তা করে। কিন্তু বর্তমান বেশির ভাগ নতুন প্রজন্ম নিজের পছন্দে খুব তাড়াতড় ডিসিশন নিয়ে ছটফট বিয়ে করছে কিংবা বাবা-মাকে যেভাবেই হোক যানিয়ে বিয়ে করছে। বছর গড়ার আগেই তার সমান্তি টানছে। ২০০৮-০০৯-এ ক'বছর ডিভোর্সের সংখ্যা এত বেড়েছে মনে হচ্ছে। এ যেন কোন সামাজিক সংক্রামক ব্যাধি। বিয়ে হওয়ার পর মাস কয়েকের মধ্যে তাদের সুখে আছো বা ভাল আছো জিজ্ঞেস করার পর শোনা যায় না তাদের সম্পর্ক টিকল না। খোঁজ নিয়ে জানা যায় খুব বড় কোনো কারণ নয়, সহ্যক্ষমতার অভাব ও পারিবারিক দায়িত্বের দায়সারা ভাব এবং সবচেয়ে ওদের চিন্তাধারা খুব দ্রুত পরিবর্তনের জন্য অপেক্ষা করার অভ্যাস নেই। এক্ষুণি বিয়ে আবার এক্ষুণি ভেঙে ফেলার প্রবণতা। এই অবক্ষয় সমাজকে যেভাবে আচম্ভ করেছে এই সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে শিহরিত হয়ে উঠি। মনে হয় এর জন্য আমরা মা-বাবা, শিক্ষক সবাই দায়ী। মূল্যবোধ জাহাত করতে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি। বহু আগে শুনতাম ‘জাতের মেয়ে কালো ভালো নদীর জল ঘোলা ভালো’ এখন একটু সংযোজন করতে চাই “সংসার সুখের হয় রমণী নয় পুরুষের গুণে, যদি থাকে গুণিপতি রমণীর সঙ্গে” আসল কথা বিয়ে মানুষের জীবনে তথু শাড়ী-গহনা জোলুস নয় কিংবা শারীরিক মিলন নয়। এটা একটি বিশাল সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্ব নিয়ে দু'টি পরিবারের মিলন ঘটান ও শান্তি-সুখ অর্জন।

এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে হলে প্রথমেই ধরে নিতে হবে ১০০ ভাগের ১০ ভাগ চিন্তাধারা মিলবে ধীরে ধীরে দু'জন এবং পরিবারের অন্য সদস্যদের সহযোগিতায় ৪০ ভাগ মিলবে। আরো ৪০ ভাগ ডিপলোমেটিক বুদ্ধি বা উপস্থিত বুদ্ধি খাতিয়ে টিকিয়ে রাখতে হবে। সব সময় ভালো পজিটিভ

সাইডগুলো কিংবা বা ছোট ছোট গুণগুলো দিয়ে উৎসাহিত করতে হবে। গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যম সমস্যার সমাধান করতে হবে। শুধু নিজেদের কি পাইনি বা দেয়নি এই চিন্তা না করে চলো আমরা একটু ত্যাগ স্থীকার করে কী দিতে পারি। আজকাল সবচেয়ে যেটার অভাব সেটা হলো সময় দেওয়া, ঘরোয়া আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে অঙ্গুরে যে কোনো সমস্যার সমাধান হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা। বিয়ের আগে নিজ গৃহে প্রতিটি শিশু চাইতেই সবকিছু পেয়ে যাই এবং ২/১ সন্তান থাকায় সকলেই তাদের আর্থিক মানসিক গুরুত্ব এত বেশি দেওয়া হয় ওদের কোনো দোষগুটি চোখেই পড়ে না। পুরুষ-নারী বর্তমানে জন্মে-গুণে এত কাছাকাছি এসে গেছে সবাই যার যার পয়েন্টে দৃঢ় থাকতে চায়। এ কারণে শেষ পর্যন্ত সম্পর্ক ছেদকেই তারা একমাত্র সমাধান মনে করে। আগামী প্রজন্মের জন্য এ প্রবণতা খুবই ভয়ঙ্কর। আল্পাহ প্রদত্ত সম্পর্ক মধুর-দীর্ঘায়িত করতে আমাদের সবার ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ন করি। এ সম্পর্কের দীর্ঘ আলোচনার বিশেষ কারণ বর্তমানে এ সম্পর্কের তিক্ততাকে মধুরতায় নিয়ে আশা।



আনন্দধন পরিবেশে আমরা দু'জন

বক্তু সম্পর্ক

এই সম্পর্ক বেমন স্ফৌর্য তেমনি চিনতে ভুল করলে নারীকীয় সম্পর্কে পরিণত হয়। ভালোর চেয়ে মন্দই এসে গেছে এখানে। তাই বাবা-মার

উচিত ছোটবেলা থেকে গল্পের মাধ্যমে নিজের ঘটে যাওয়া ভালোমন্দ ঘটনা তুলে ধরে পরোক্ষভাবে সমাধান করে দেওয়া। নিজ সন্তানের সঙ্গে সহয় দিয়ে বক্তু সম্পর্ক রেখে তার মনের ভুবনের খোজ-খবর রাখা, দুষ্ট বন্ধুর চেয়ে শৃঙ্খ গোয়াল ভালো। সন্তানকে আনন্দ-খুশিতে রাখার জন্য বেশি অর্থের প্রয়োজন হয় না। সবয় দেওয়া এবং সময় দিতে না পারার জন্য তাদের কাছে দুঃখ প্রকাশ করা ভালো। কিন্তু বেশির ভাগ বাবা-মা বিশেষ করে কর্মজীবী এবং অতিবাস্তু বা নিজেকে তুলে ধরতে অধিক আনন্দ পান তারা বিকল্প পক্ষ হিসাবে অর্থের সাহায্য নেন। দামি খেলনা বাসায় রেখে নিজেদের আনন্দ উপভোগ করার প্রবণতা থেকেই সন্তান নিজেকে মূল্যহীন বা অধিক মূল্যবান এবং ভালোবাসা শূন্য, আদর-যত্নশূন্য এক কঠিন-কঠোর মানুষে পরিণত হয়। এখন সময় আসছে আপনার-আমার সন্তানের মাথায় হাত দিয়ে বুকে টেনে সম্পর্কের গভীরতার পরিধি তৈরি করার। কথায় আছে 'যে সহে সে রহে'। সম্পর্ক ছেদে হয়তো রাগ করে কিন্তু কেউই সুন্দৰ হতে পারে না। সব ধরণের সম্পর্ক সময়ের জন্য লিখতে পারলাম না, তবে যে দৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ তা সম্পর্কে লিখলাম।

আশা করি এ বিষয়ে আরও দীর্ঘ আলোচনা করে সম্পর্কের গুরুত্ব তথা গভীরতা সম্মান প্রয়োজন ইত্যাদির সমাধান খোজা এবং শান্তি ও সুখ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব। সকলে মিলে আজ বলি সম্পর্ককে দীর্ঘজীবী ও চিরস্থায়ী করি এবং আনন্দময় করি।



সোমা ও তানজিলা



হেদেন ও আমি

কু-সংস্কার

“যাহ! যত সব কু-সংস্কার!” এইভাবে কু-সংস্কার শব্দটি আধুনিক সমাজে বিদ্রূপ ও হাঙ্গা ঠাণ্ডা সহকারে ব্যবহৃত হয়। যুগ যুগ মানুষ এই শব্দটির সাথে পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত। অনেক বিজ্ঞানভিত্তিক বা প্রমাণভিত্তিক ঘটনা না হলেই কু-সংস্কার বলে উভিয়ে দেয়। কিন্তু আমরা



জন্মদিনে মাঝের সাথে আমরা

যদি গভীরভাবে চিন্তা করি “কু” বলা হচ্ছে সেটা কি সংস্কারের জন্য ‘কু’ নাকি আধুনিকতা বিবর্জন “কু”। আসলে যুগের পরিবর্তনের সাথে তাল মিলাতে না পারলে বলা হয় কু-সংস্কার, তাল কি মন্দ এই তথ্য কেহ তলিয়ে দেখেন। আজকের আধুনিকতা আগামীতে আরও দ্রুত পরিবর্তনে কুসংস্কার হয়ে দাঢ়ায়। যখন চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রথম ভেষজ ঔষুধ, বাঢ়কুক হত মানুষও তাল হত কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতিতে সেই হল সেই পূর্বের চিকিৎসা কি ভুল বা খারাপ ছিল? আমি নিজে জন্মস জড় ভেষজ চিকিৎসায় তাল হয়েছি তা নিশ্চয়ই অকীকার করব না। কিন্তু আধুনিক ডাক্তারকে একথা বলবে, আপনি এত শিক্ষিত হয়ে এখনও ওই কুসংস্কার মেনে

চলেন? কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে বিজ্ঞানভিত্তিক না হলেও একই উপাদান হ্যাত ঐ শিকর গাছ-গাছড়ায় লুকায়িত আছে। না হলে বা ট্যাবলেট ছাড়া ভাল হলাম কি করে? সামাজিক কিছু আচরণ-আচরণে আমরা একে অন্যকে ব্যাক ডেটেড বা কু-সংস্কারাঞ্জনী বলে থাকি। যেমন ছেলে-মেয়ের একত্রে কাজ করা, মেলা মেশা ইত্যাদি। কিন্তু বহু পূর্বেও একত্রে মহিলা পুরুষ নামাজ পড়া, কৃষিক্ষেত্রে কাজ করা ছিল এখনও আছে। তবে পার্থক্য হল অক্র এবং কতটা মিলা যাবে তার অনুপাত। তখন ছিল না এত উচ্ছ্বলতা এত স্বল্প বাস এবং দৈহিক আবেদন। তাই কোন সামাজিক ক্রাইমের কথা শোনা যেত না। কিন্তু এখন অহরহ যা শুনছি তা হতাশা, লজ্জা এবং দৃঢ়ব্যবস্থার ঘটনা। আধুনিকতার নামে, উচ্ছ্বলতা যে ভাল সংস্কার নয় সেটা বলতে গেলে ঐ একই কথা বিদ্রূপভাবে শুনতে হবে। বিজ্ঞান মানুষকে, সমাজকে সত্য এবং উন্নত রে। এটা একইভাবে সত্য কথা কিন্তু এটা নির্ভর করছে প্রয়োগ ও যেমনের উপর। তিস এন্টিনা আমাদের বিজ্ঞানের বিরাট অবদান কিন্তু তার প্রপ্রয়োগ সমাজকে আজ কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তার বলার অপেক্ষা রাখে না। মানুষের মাধ্যমে বৃক্ষের উৎকর্ষতা যত বাড়ছে ততই নয়তা দিয়ে উন্নতির প্রগতি দেখাতে চাচ্ছে, নইলে “বিশ্ব সুন্দরী প্রতিযোগিতা” কি করে সারা বিশ্বে এত সমাদৃত হয়? ভুল বুবাবেন না আমি কিন্তু সুন্দর পূজারী, কারণ “Beauty is truth” কিন্তু কথা হচ্ছে আবার সেই সংস্কার নিয়ে। বিশ্বের বাজারে পণ্য-দ্রব্য সামগ্রীর মত সৃষ্টির রহস্য লজ্জা-সম্মানস্বর বিকিয়ে ক্ষুদ্র কাপড় তাকে বহু আগের অসত্য যুগের কৃতদাস ত্রয়ের মত মেপে, ওজন দিয়ে সংস্কারের পর্যায়ে ফেলা যায়? ফুলন দেবি যাকে নাম দিয়েছে কুসিত প্রতিযোগিতা। ভারতে এবার সুন্দরী প্রতিযোগিতার বিরোধিতা করে কয়েকজন আত্মহত্য দিয়েছে। আমরা আধুনিকতার নামে কোথায় নেমেছি? নুরজাহান ছিলেন বিশ্বের সেরা সুন্দরী কৈ তাকে ত এই ধরনের প্রতিযোগিতায় নামতে হয় নাই। গোলাপ ফুলের সৌন্দর্য সুগন্ধি অনুভব করার দরকার হয় না। তার সৌরভ রং চেহারা সকলকে স্বাভাবিক নিয়মে আকৃষ্ট করে।

যতই আধুনিকতার নামে, দ্রুতময় জীবন ধারনের নামে বহুগামী ফ্রিমেরিং, সমগামী হচ্ছে ততই দ্রুগ হতাশার মত অভিশাপ সমাজকে ভেঙে টুকরো টুকরো করছে। মানসিক প্রশান্তি আত্মবিশ্বাস হারিয়ে নানা ব্যাধিতে

ভুগছি। অশালীন কিছু বিকৃতকৃপী লোকের সাময়িক মোহের আনন্দধারা হতে পারে কিন্তু শিল্পের সুস্কুমার সুন্দর ধারাগুলি লোপ পেয়ে মরণভূমিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতে পারে। এত কিছুর পর যদি কেহ বলে এখন সমাজ উন্নতি হচ্ছে আর আমাদের বলবে তোমরা আদি যুগের, এ যুগে চলতে হলে এই সব কু-সংস্কার বাদ দেও।

ছোট বেলায় চন্দ্র গ্রহণ, সূর্য গ্রহণ, অমাবস্যা, পূর্ণিমার সময় খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে কিছু নিয়ম-কানুন মানা হত। কিন্তু লাভ কি হত সেটা বিতর্কমূলক, ক্ষতি হত না। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে অমাবশ্যার দর্শণ সমুদ্র নদীতে জোয়ার ভাটা হচ্ছে। তবে এত শক্তির গুণ যখন আছে তার তীব্র রশ্মির অপক্রিয়া থাকতে পারে। ক্ষণ সময়ে হয়ত তার বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। তাই বলছি সব কুসংস্কার নয়।

শাড়ী বাঙালী নারীর ভূষণ এবং আকৃতি। কিন্তু আজ কি দেখছি নিজেরদের কৃষি-সাংস্কৃতি সব ভুলে আজ অনেকেই যে বিদেশিদের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ভাগিয়ে ছিলাম তাদের প্যাট-শার্ট, ক্ষটি টপস পড়ে মেয়ে মা দিব্য খুকি সেজে সমাজের উচু স্তরে হাত রঙিল পানীয় নিয়ে সম্মানিত হানে অবস্থা করতে পছন্দ করে। তারা কি করে ভুলে যান ইন্দিরা গান্ধী, মাদার তেরেসা, বন্দর নায়েক, শেখ হাসিনা বিশ্বের বরেণ্য নেতৃবৃন্দ শাড়ী পড়ে দেশিয় কায়দায় কর সম্মান পাচ্ছেন। তবে কেন নিজেকে নিজের দেশের সাংস্কৃতিকে বৃত্তে আঙুল দেখিয়ে কাক হচ্ছে ময়ূরের পুছ পড়ে তথাকথিত ক্ষণিকের শ্যার্ট লেডি হতে যাচ্ছি। এ কথা বলতে গেলে আবার আমাকে কু-সংস্কারাচ্ছন্ন মহিলা বলে বিদ্রূপ করবে। আসলে কু-সংস্কার যাকে আমরা বলি সেটাই ছিল আকৃতি। সেখানে নারীর যে সম্মান আছে তা আর কোথায়ও নেই। আমি কিন্তু তথাকথিত কালো বোরখা পরিহিত হতে বলছি না, সর্বক্ষেত্রে অর্ধাং পোশাক ব্যবহারে খাবারে ঝুঁটী এবং সংযম দেখানোর কথা বলছি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই ভাল-সুন্দর সংযম কাজকে কুসংস্কার বলা যায় না।

সামাজিক অবক্ষয়ের জন্য দায়ী কে?

বর্তমান সমাজের অবক্ষয়ের কথা সচরাচর আলোচিত হচ্ছে কিন্তু কেন অবক্ষয়, কারা এর জন্য দায়ী এ কথা আমরা এড়িয়ে চলি। যদি প্রশ্ন করা হয় কারা দায়ী? উত্তর ভেসে আসবে সহশ্র কষ্টে আমরা, আমরা কারা? আমরা অভিভাবকরা, মাতা-পিতা গুরুজন, শিক্ষক মন্ত্রী সকলেই।



কুসংস্কারের শূন্তি

মানব সত্ত্বান যখন পৃথিবীতে আসে তখন সেই শিশু থাকে পরিত্র, নিষ্পাপ। সে আসে হাসোঙ্গল বিধাতার রূপ নিয়ে। কিন্তু নিষ্ঠুর পৃথিবীর নানা চক্রে, দুঃখে অনাদর, অপমানে সেও হয়ে উঠে একদিন কুটিল, নৃশংস, ভয়ঙ্কর। আমরা বাঙালী সমাজ কথায় যত ডঙ্কা বাজাই কাজে তত ফাঁফি। সব সময় একের দোষ অন্যের কাঁধে চাপিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার জন্য ব্যস্ত থাকি। তা' কখনও বুদ্ধির জোরে, কখনও শারীরিক জোরে আবার কখনও বা আর্থিক সামাজিক প্রতিপত্তির জোরে। কিন্তু নিজেকে যদি গোপনে প্রশ্ন করি, আমি কি এই অবক্ষয়ের জন্য দায়ী? উত্তর আসবে ফিস ফিস করে হ্যাঁ আমি দায়ী।

নারী সমাজ যুগে যুগে তার বিভিন্ন রূপ দেখিয়েছেন। তার কারণে

যেমনি দ্রুয় নগর ধৃংস হয়েছে তেমনি বিশ্ব বরেণ্য মা-ফাতেমার কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। মাকে হতে হবে ইন্দিরা গান্ধী, মার্গারেট থেচারের মত শক্ত সুন্দর প্রজিতৃত্বয়ী আবার কখনও এই নারীকেই হতে হবে মাদার তেরেসা, ফ্লোরেন্স নাইচিসেল, সুলতানা রাজিয়ার মত।

একমাত্র মা, বৌন, জয়া, কল্যা এই বিভিন্ন রূপে নারীকে হতে হবে ধর্মীত্বের মত কোমল-কঠোর, আকাশের মত উদার। মা পৃথিবীতে জন্ম দিয়েছেন যুগে যুগে শ্রেষ্ঠ মানব সন্তানদের-নবী করিম (সঃ), ইশ্রাচন্দ্ৰ বিদ্যাসাগৰ, বায়েজিদ বেন্সামী, আরও অনেক বরেণ্য নেতা সবার জন্ম দিয়েছে এই নারী, নারীই পারে পৃথিবীকে স্বর্গ করতে আবার নরকে পরিণত করতে।

আজ এই ক্ষমতিলগ্নে আমরা প্রতিটি ঘর, স্কুল, কলেজ, অফিস আদালত নারীর, সংবেদশীল মায়া, ভালবাসা, স্নেহ দিয়ে যদি ভুক্ত দেই তবে কেন আমাদের সন্তানরা নষ্ট হবে? কেন বিশ্ববিদ্যালয় কঠোর পরিণত হবে? রাস্তা-ঘাটে মানুষ কেন নিষিদ্ধে চলফেরা করতে না? আমাদের জানতে হবে ওদের কষ্ট কোথায়, অশান্তি কোথায়?

আধুনিকতার নামে নারী সমাজ নিজ দায়িত্ব ভুলে গেলে না। বাবা-মা দু'জনেই যদি সামাজিক কাজের দোহাই দিয়ে বাইরে আসে সময় কাটাই। নিজ সন্তানদের সাথে কিছুক্ষণ না কাটাতে পারে তবে বিসেই সমাজের? যদি ওদের অসুবিধা, ছেট ছেট সমস্যা, কষ্ট আমরা আভালার মাধ্যমে, আদরের মাধ্যমে সমাধান করতে না পারলাম তাহলে আমাদের কৃতিত্ব কোথায়? রস্লুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, প্রথম তিনটি স্তর নারীর আসন সেই সম্মান বজায় রাখতে আমাদের যে ধৈর্য, সহানৃতি, স্নেহ, ভালবাসা, শাসন প্রয়োজন তা' ভুললে চলবে না। বাবা-মার আদর-ভালবাসার কোন পরিপূরক নেই কারণ একমাত্র পৃথিবীতে নিঃস্বার্থ ভালবাসা তাঁরাই দিতে পারেন। বর্তমানে আমরা ব্যক্তিতার নামে সেই কোমল দৃদয়ের সন্তানদের বিশ্বিত করছি ভালবাসা-আদর থেকে। তাদের মন গুমরে গুমরে হাহাকার করে ফিরছে, সাতনা দেবার কেহ নেই, তারপর সৃষ্টি হচ্ছে নৃশংসতার, সৃষ্টি হচ্ছে হাইজ্যাকার, সবার আদর-স্নেহ থেকে বিশ্বিত হয়ে ওরা নারীর দুশ্মন হয়ে নারীকেই পথে ঘাটে অপমান করছে, ছিনতাই করছে।

যে আঙ্গনে ওরা জ্বলছে, যারা ওদের লোভ লালসার শিকার করছে, তাদের থেকে ওদের রক্ষা করতে হবে। নইলে পৃথিবীতে 'মা' নামক মধুর

ডাকটি শুধু একটি শব্দ হয়ে থাকবে। এর ব্যাপকতা, পর্যবেক্ষণ, শক্তি সব অতল অন্ধকারে হারিয়ে যাবে। আমরা বরেণ্য নেতা, বা নবী-রসূলের 'মা' না হতে পারি কিন্তু একটি সুস্থ, সুন্দর ভদ্র, চরিত্রবান সন্তানের মা ত হতে পারি চেষ্টা করলে। আসুন আজ আমাদের নারী সমাজের শপথ হোক আমাদের সন্তানদের বাঁচাতে হবে। পৃথিবীকে ক্ষেত্রমুক্ত করতে হবে। চৰকল, অভিমানী, দুষ্ট সন্তানদের বুকে টেনে চুপিচুপি কানে কানে বলি "আর যুদ্ধ নয় আর রাহাজানি, বোমা বাজী নয়, আর নয় নৃশংস হত্যা, মাদকসিঙ্ক"। তবে এ কাজে মা'র অহঙ্গণ ভূমিকা থাকলেও বাবার কর্তব্য ভূললেও চলবে না। এই প্রসঙ্গে সমাজের আর একটি দিক তুলে ধরার প্রয়োজন অনুভব করছি, মা যতই কর্তব্য পরায়ণ হোক না কেন গৃহ যেহেতু এখনও শাসিত হচ্ছে পুরুষ দ্বারা সেহেতু সমাজ গঠনে তাদেরও রাখতে হবে মৃত্যু ভূমিকা। পুরুষ মহল যদি সত্যিকার অর্থে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে না দেয়, নারীর গাপ্য সম্মান, ভালবাসা, মর্যাদা, কাজ করার স্বাধীনতা ইত্যাদি নিশ্চিত করে ট পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য না করে তবে এতক্ষণ যা বলা হল 'তা' বাস্তবায়িত হতে পারবে না। আবার সন্তানের সাথে সরাসরি মা যেমন জড়িত হয়ে সমস্যার সমাধান করতে পারেন তেমনি পুরুষ অর্ধাং প্রতিটি গৃহের স্বামীকে সরাসরি নারী বা তার স্ত্রীর প্রতি সহযোগী হতে হবে, যোগাযোগ রাখতে হবে। ভাল কাজের গুনাগুণ-কার্যদক্ষতা হাসিমুখে প্রশংসন করতে হবে। কারণ ভূললে চলবে না সন্তান কারও একার নয়। বাবা-মার ভালবাসা স্বীকৃত যা দেখে সন্তানরা ভালবাসতে শিখে। আবার পর্দার আঁড়ালে থেকে যারা অসহায় নারী, মাসুম সন্তানদের নিজের স্বার্থে খেলাচ্ছে তাদের মুখোশাও খুলে ফেলতে হবে।

বিন্দু বিন্দু পানি যেমন সিন্ধুর সৃষ্টি, তেমনি ছেট ছেট ভালবাসা, আদর, আহ্লাদ সমাজের বর্তমান ভর্তুকের রূপ পাল্টে আবার সোনার বাংলার সোনার সন্তানদের সুনাম ছড়িয়ে দিতে পারে। আমরা সকলেই যদি একটি সংবেদনশীল, ত্যাগী, পরিবেশ গঠন করতে পারি তবেই আমরা আমাদের সমাজকে অবক্ষয় হতে রক্ষা করতে পারি। আর কোন ভালিয়া, রীমার অপমৃত্য আমাদের কাম্য নয়। কোন মায়ের বুক খালি করে যেন আর্তিচৎকার না ভেসে আসে। আমরা শান্তি, স্বষ্টি, আনন্দ চাই।

অন্তৰে তুমি আছো

১৯৭৫ সনের ১৫ আগস্ট বাঙালি জাতির কলঙ্কময় দিন। কিছু পথভঙ্গ সামরিক বাহিনীর সদস্য ও মীর জাফরের চক্ষাতে নিজ ভবনে হত্যা করল বাঙালি জাতির প্রাণ প্রিয় নেতা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানকে।

ভাবতে পারি না ১৯৭১-এর ৭ মার্চ যার ডাকে ও উদান্ত আহ্বানে বাঙালি জাতি আবালবৃক্ষ বণিতা মুক্তির সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, সেই মানুষ যাকে পাকিস্তানের কারাগারের পাশে কবর খুঁড়ে মারতে পারল না সাহসে কুলাল না, আর তাঁকেই কি না নিজ গৃহে হত্যা করল কিছু স্বার্থবেষী মানুষ। তখন শেখ মুজিবুর রহমানকেই নয়, ছোট শিশু রাসেল, জামাল, কামাল ও পুত্রবধুসহ আরও আত্মায়ুক্তিকে কত অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হল।

যাঁর কঠে সেই আহ্বানে বাঙালির ঘরে ঘরে এখনও বেজে উঠে। “আমি যদি হকুম দিবার না পারি তবে যার যা আছে তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পরবে, এবারের সংগ্রামে মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতাৰ সংগ্রাম”।

যাঁর ডাক না শুনলে বাংলাদেশের জন্য হত না, ১৯৭১-এর ১৬ই যিনি পালিয়ে যেতে পারতেন। তাঁর রাজনৈতিক হিতেশী বন্ধুরা তাঁকে কে করেছিল তাঁকে নিয়ে যেতে। কিন্তু তিনি পলায়মান পুরুষ ছিলেন না; তিনি পাকিস্তানী আর্মিদের হাতে ধরা দিলেন বীরের মত। কি করণ দৃশ্য। তিনি ভবনে সিড়ির উপর তাকে মেরে ফেলা হল। এই ১৫ আগস্ট রক্তাঞ্চল কলাট দিবস। কি করে আমরা এই কলক্ষের দায় থেকে মুক্তি পাব।

শেখ মুজিবুর রহমান যিনি ছাত্র অবস্থায় কখনও মিথ্যা ও অন্যায়ের প্রতি মাথা নত করেননি। ১৯৫২-১৯৭৫ এই সংগ্রামী জীবনের জন্য তিনি হলেন জাতির পিতা, সেই পিতাকেই হত্যা করা হল। তিনি জীবনের অর্ধেক সময় কারাগারে কাটিয়েছেন এই কি তার প্রতিদান। তিনি কখনও ভাবতেও পারেননি তাঁর কোন শক্তি আছে নিজ দেশে।

এই কলঙ্কময় হত্যায়জ্ঞের পিছনে যাদের হাত ছিল বাঙালি জাতি এবং ইতিহাস তাদের কখনও ক্ষমা করবে না, কত সাহসী পুরুষ তিনি, যিনি একমাত্র বাঙালি বাংলায় ভাষণ নিয়ে ছিলেন জাতিসংঘের অধিবেশনে, বাংলা ভাষার মান-মর্যাদা উচ্চ স্তরে নিয়ে গিয়েছিলেন।

হত্যাকারীদের মনে রাখতে হবে বাঙালি জাতি আরও সংঘটিত হয়েছে, এই মৃত্যু আমাদের বাংলাকে শক্তিতে রূপান্তরিত করেছে। চিরকাল তাঁর স্বাধীনতার আহ্বান, সাহস ও শক্তি দিবে বাঙালিদের।

উত্তরা লেডিজ ক্লাব বিদ্যালয় প্রসঙ্গে কিছু কথা

মনে পড়ে এইতো সেদিনের কথা, জামিলা আপা ও আমি ঢাকা উইমেন কলেজের শিক্ষিকা। চমৎকার অসমবয়সী বন্ধুত্ব যা এখন পর্যন্ত গভীরতা বিস্তার করেই চলছে। যা হোক যা বলছিলাম, অধ্যাপিকা জামিলা আজাদ আমাকে বললেন, তল উত্তরা লেডিজ ক্লাবে মেদার হবি। আমি যেহেতু ওনাকে ভীষণ পছন্দ করি তাই আর বিরক্ত না করে তাঁর হাত ধরে মেদার হলাম ১৯৯২-১৯৯৩ সনে।



জন্ম ক্লাবে হাসনা মওনুদ, রেজওয়ানা, মায়া ও আমি

সেখানে গিয়ে প্রথম দিন ভীষণ ভাল লাগল আর এক ব্যক্তিত্ব উত্তরা লেডিজ ক্লাবের প্রেসিডেন্ট জাহানারা ইসলামকে দেখে। চমৎকার আকৃষ্ণ করার মত ব্যক্তিত্ব যা আজও মন ছুঁয়ে যায়। এর পর বীরে জানলাম আমাদের লেডিজ ক্লাব শুধু বিনোদন নয় সমাজ উন্নয়নের কিছু প্রকল্প শুরু করেছে। তার একটি ছিল সমাজের অবহেলিত শিশুদের বিদ্যালয় ও তাদের স্বাস্থ্য সচেতনতার নিমিত্তে একটি ফ্রি-ক্লিনিক। খুব ভাল লাগল, এই ধরণের সংগঠনে নিজেকে কিছু করতে পারায় ধন্য মনে হল।

স্কুলটির দায়িত্বে প্রথম যিনি ছিলেন তার নাম অবশ্য শক্তা ভরে মনে পড়ে। তিনি আমাদের সদস্য আনোয়ারা রহমান সদস্য নং ৪৯ বীজ যিনি বপন করেন তার কৃতিত্ব চির স্মরণী হয়ে থাকে। তাই আনোয়ারা রহমানকে আমাদের সকলের তরফ থেকে দশম বর্ষপূর্তি স্মরণিকায় জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এরপরে স্কুলের ভার নিলেন আলম আরা মাহমুদ সদস্য নং ৬৮, তাকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আর একজনার নাম বলতেই হয় তার নাম রীমা। রীমা আমাদের প্রেসিডেন্ট আপার ভাস্তি। নিজেও ছাত্রী ছিল তবুও সে চমৎকার আন্তরিকতায় স্কুলটি চালিয়ে যেত। তাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। আমাদের আর একজন সদস্য সালেহা ওহাব। তিনিও কিছুদিন স্কুলের শিক্ষকতা করেছেন, তাকেও জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। এরপর মুক্তি, বিলকিস এবং বর্তমানে আরও দুইজন নবীন শিক্ষিকা চমৎকারভাবে স্কুলে শিক্ষকতা করছে।

১৯৯৪ সনে কার্যকরী কমিটির শিক্ষা ও সাহিত্য সম্পাদিকা হিসেবে আমি হোসনে আরা স্কুল পরিচালনার ভারপ্রাপ্ত হই। সকল সদস্য ও কার্যকরী কমিটির সদস্য বোনদের দেয়া অর্থ ও সহযোগিতায় স্কুলটিতে একটা সুন্দর নিয়ম শৃঙ্খলায় নিয়ে আসা হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীর বেশীর হাতে বিভিন্ন বাসায় কাজ করে বা অন্য কোন ক্ষেত্রে কাজ করে ৩/৪ ঘণ্টা নিয়ে নিজেদের একটু পড়া-লেখায় নিরোজিত করে।

১৯৯৬-২০০০ সাল পর্যন্ত অধ্যাপিকা জামিলা আজাদ এই স্কুল পরিচালনায় টানা চার বছর ছিলেন। স্বাভাবিকভাবে স্কুলটির আরও উন্নত হয়েছে। এরপর আমি আবার ২০০০ সাল থেকে ২০০১ সাল বর্তমান সংয়োগে কাল পর্যন্ত এই স্কুলের দায়িত্বে আছি। এবার বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা কার্যক্রম চালু হয়েছে। যদিও এটা জামিলা আপার স্পন্সর ও প্রেসিডেন্ট আপা এবং উত্তরা ক্লাবের সব সদস্যদের স্পন্সর ছিল। তাইস প্রেসিডেন্ট মুরম্মাহার ও ট্রেজারার তাহেরা এরশাদ এদের অবদান যথাক্রমে-বই, খাতা, প্রেসিল কেনা ও সদস্য বোনদের থেকে শিক্ষা কার্যক্রমের টাকা আদায় করে কাজ পরিচালনায় সাহায্য করার সাহায্য সত্ত্ব প্রশংসনীয়। বছরের বিশেষ দিনে ভাল খাবার এবং জাতীয় ও ধর্মীয় বিশেষ দিনে ওদের অনুষ্ঠান করান হয়। বাংলাদেশিক গীত করা হয়। দৈনে নতুন কাপড়ও শীতে কাপড় দেওয়া হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে ওদের বিভিন্ন ধরণের খাবার দেন। ওদের বিনোদনের ব্যবস্থায় এইবার আমাদের ক্লাবের জি.এস. রাশেদা আহসান স্কুলের ছাত্র-

ছাত্রী এবং ক্লাবের কর্মচারীদের নিয়ে বেটানিকাল গার্ডেন ও চিড়িয়াখানায় নিয়ে ওদের একটি দিন স্মরণীয় করেছিলেন এবং সেদিন ওদের বিশেষ খাবার দিয়েছিলেন। এবার গত ১৮ সেপ্টেম্বর লায়স ক্লাব থেকে আমাদের সদস্য বোন রওনক হামেদ লায়স, প্রেসিডেন্ট বাচ্চাদের নেলকাটার, সাবান ও চকলেট দিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার ব্রত দিয়েছেন।

আমার লেখা শেষ করার পূর্বে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই প্রেসিডেন্ট আপা জাহানারা ইসলাম, ভাইস প্রেসিডেন্ট মুরম্মাহার কাদের যিনি খাতা, কলম, বই দিয়ে সব সময় স্কুলের কাজ চালাতে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া ভাইস প্রেসিডেন্ট শাহীন ফারুক ও রফিসানা আলম স্কুলের প্রতিটি কাজে সাহায্য করে যাচ্ছেন।

এই স্কুলের দীর্ঘ সময় যে শিক্ষিকা ছিলেন তার নাম এই স্মরণিকার মর্মতৎপরতায় অবশ্য ধন্যবাদ সহকারে মনে করছি তিনি বিলকিস। তামানে দু'জন শিক্ষিকা আছে তারাও প্রচণ্ড আনন্দ নিয়ে ও চমৎকার মর্মতৎপরতায় স্কুল সুন্দরভাবে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। রাজিয়া আপা বছদিন রে শিক্ষিকা হিসাবে আছেন। এখন স্কুল কমিটি লুৎফুন নাহার ও সেলিনা হাসেন স্কুলের কার্যক্রম পরিচালনা করছেন।

দশম বর্ষপূর্তি দিবিসে আবারও জানাই সকলকে আন্তরিক উৎস ওভেজ্যা এবং ক্লাবের উত্তরোন্তর উন্নতি কামনা করছি।



হেলেন জাহানারা-এর সাথে আমি হোসনে আরা ইন্দ্রিস

আমার লেখা / ৫৩

নারীর উন্নয়ন

“কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী”
-কাজী নজরুল ইসলাম।



আমার সাথে আমার দুই মেয়ে সোমা ও সুখি

নারী চিরকাল ভাল কাজে পুরুষকে শক্তি জুগিয়েছে, তবে সেই নারীর অবস্থান কোথায় সেই প্রশ্ন কেন? কেন নারীর অবস্থানের পরিবর্তন হয় কেনই বা নারীর উন্নয়নে ধীর গতি? ১৫ জানুয়ারি ২০০৮ (সমকাল) পত্রিকায় দেখলাম একটি সেমিনারে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অবদান রয়েছে। কিন্তু দৃঢ়জনক হলেও সত্য, আমাদের নারী সমাজ দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এর উন্নয়ন প্রয়োজন। নরওয়ের রাষ্ট্রদূত ইন গোবিয়োর্গ স্টারিং বলেন, সারা পৃথিবীব্যাপী প্রায় সব দেশেই এই বৈষম্য ও নির্যাতন চলছে, কখনও শারীরিক কখনও মানসিক অথবা সাময়িকভাবে।

“আমি নারী সারা পৃথিবী আমার যুক্তিক্ষেত্র” কথাটা যুগে যুগে চলে

আসছে। তবে নারী জাতির অবস্থানের সাধারণ পরিবর্তন আমাদের দেশে হয় সেটা জন্মের পর বিয়ের আগ পর্যন্ত পিত্রালয়ে। এর পর শুভ্র বাড়ী অথবা স্বামীর বাড়ী। বৃন্দকালে বা বিধবা হলে পুত্রালয়ে এইভাবে অর্থাৎ কি করণ অবস্থান কারণ সব থাকার পরও নিজস্ব বাড়ী এ কথা সহজে বলা যায় না। সব অবস্থান কেমন জানি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তোমার অবস্থান যে কোন সময় বদলাতে পারে। কারণ তোমার অবস্থান সব সব অস্থায়ী।

এখন আমি কয়েকটি অবস্থানের পরিবর্তনের কথায় আসি।

(১) নারী জাতির অবস্থানের ঐতিহাসিক প্রাজয় ও বৈষম্য: নারীতত্ত্বের উচ্চেদ ঘটে পুরুষ তত্ত্বের রক্ত পাতাইন অভ্যাসানে। মাতৃতাত্ত্বিক ও বচপতি এবং জমিচাষের পট পরিবর্তন হয়ে পিতৃতাত্ত্বিক ও বহু পত্রি এবং জাম চাষ ক্রমাগ্রয়ে পুরুষের হাতে চলে যায়। পুরুষ হয়ে ওঠে ভৃ-স্বামী এবং ক্ষমতার বিধিকারী, নারীকে এইভাবে ক্ষমতা ও শাসন থেকে সরিয়ে পরাজিত করা হয়। পুরুষ তাত্ত্বিক সভ্যতা নারী কাঠামো সৃষ্টি না করলে নারী ভিন্ন জাতি বরং জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে। সকলেই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি মানুষ এ কথা না বলে কখনও অবহেলিতভাবে বলল, মেয়ে মানুষ মেয়েলোক আবার কখন কাব্যে নারীকে অভিরঞ্জিতভাবে দেবী, অঙ্গী ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেছে, কখনও ভোগের সামগ্রী কখনও বিনা পয়সায় দাসী কাজের ঘরে এই হিসাবে গণ্য করেছে, মানুষ হিসাবে নয়। অর্থাত জাতীয় শ্মরণীয় ঘটনায়, স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান কোনক্রমেই অবহেলিত ছিল না।

(২) নারীর প্রতি বিধি-বিধান: পুরুষ নারীর প্রতি বিধিগুলি তৈরি করেও অবস্থানের পরিবর্তন করেছে। যেমন বিধবাবিবাহ, সহমরণ, গোত্র-জাতের চিন্তা, বাল্যবিবাহ, ঘাটের মরার সাথে বিবাহ দেওয়া শুধুই জাত-ধর্ম হিক রাখার জন্য। অর্থাৎ সমাজ-সংসারের জন্য পুরুষ জাতির কি কি করণীয় তা তাদের সুবিধামতই হচ্ছে। সেখানে নারীর নেতৃত্ব নেই, কোন মতামত দেওয়ার সুযোগ ছিল না। নারী পুরুষ কাজের সম-অধিকার সংস্কৃতি চর্চার কোন বিধান থাকল না।

নারীর শত্রু-মিত্র অবস্থানের জন্য দায়ী: নারীর শত্রু নারী একথা সত্য কিন্তু কেন সত্য তা অনেকেই ভেবে দেখেন না। এর কারণ সেই পুরুষের ক্ষমতা, অন্যায় ও অত্যাচারের শাসনের জন্য শিশুকাল থেকেই একটি কন্যা সন্তানকে শেখান হয় অন্যায় হলে প্রতিবাদ করো না, আন্তে কথা বল, পুরুষকে তথা সমাজকে ভয় করে সবসময় সবকিছু মেনে তাদের তুষ্ট কর।

নারীর উন্নয়ন

“কোনকালে একা হয়নিকো জয়ী পুরুষের তরবারী
প্রেরণা দিয়েছে শক্তি দিয়েছে বিজয় লক্ষ্মী নারী”
-কাজী নজরুল ইসলাম।



আমার সাথে আমার দুই মেয়ে সোমা ও সুবি

নারী চিরকাল ভাল কাজে পুরুষকে শক্তি জুগিয়েছে, তবে সেই নারীর অবস্থান কোথায় সেই পশ্চ কেন? কেন নারীর অবস্থানের পরিবর্তন হয় কেনই বা নারীর উন্নয়নে ধীর গতি? ১৫ জানুয়ারি ২০০৮ (সমকাল) পত্রিকায় দেখলাম একটি সেমিনারে প্রধান উপদেষ্টা বলেন, আমাদের জাতীয় জীবনের প্রতিটি উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নারীর অবদান রয়েছে। কিন্তু দৃঢ়খজনক হলেও সত্য, আমাদের নারী সমাজ দীর্ঘদিন ধরে বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এর উন্নয়ন প্রয়োজন। নরওয়ের রাষ্ট্রদূত ইন গোবিয়োর্গ স্টারিং বলেন, সারা পৃথিবীবাপী প্রায় সব দেশেই এই বৈষম্য ও নির্যাতন চলছে, কখনও শারীরিক কখনও মানসিক অথবা সাময়িকভাবে।

“আমি নারী সারা পৃথিবী আমার যুক্তিশ্বর” কথাটা শুনে শুনে চলে

আসছে। তবে নারী জাতির অবস্থানের সাধারণ পরিবর্তন আমাদের দেশে হয় সেটা জন্মের পর বিয়ের আগ পর্যন্ত পিত্রালয়ে। এর পর শুধু বাড়ী অথবা শামীর বাড়ী। বৃক্ষকালে বা বিধবা হলে পুরালয়ে এইভাবে অর্ধাংকি করণ অবস্থান কারণ সব থাকার পরও নিজস্ব বাড়ী এ কথা সহজে বলা যায় না। সব অবস্থান কেমন জানি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় তোমার অবস্থান যে কোন সময় বদলাতে পারে। কারণ তোমার অবস্থান সব সময় অস্থায়ী।

এখন আমি কয়েকটি অবস্থানের পরিবর্তনের কথায় আসি।

(১) নারী জাতির অবস্থানের ঐতিহাসিক পরাজয় ও বৈষম্য: নারীত্বের উচ্চেদ ঘটে পুরুষ তত্ত্বের রজ পাতাহীন অভ্যাসে। মাতৃতাত্ত্বিক ও বহুপতি এবং জমিচাষের পট পরিবর্তন হয়ে পিতৃতাত্ত্বিক ও বহু পত্নি এবং জমি চাষ ক্রমাগতে পুরুষের হাতে চলে যায়। পুরুষ হয়ে ওঠে ভ্ৰামী এবং ক্ষমতার অধিকারী, নারীকে এইভাবে ক্ষমতা ও শাসন থেকে সরিয়ে পরাজিত করা হয়। পুরুষ তাত্ত্বিক সভ্যতা নারী কাঠামো সৃষ্টি না করলে নারী ভিন জাতি বৰং জাতি হিসাবে চিহ্নিত করে। সকলেই সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি মানুষ এ কথা না বলে কখনও অবহেলিতভাবে বলল, মেয়ে মানুষ মেয়েলোক আবার কখন কাব্যে নারীকে অতিরিক্তভাবে দেবী, অলৱী ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত করেছে, কখনও ভোগের সামগ্ৰী কখনও বিনা পয়সায় দাসী কাজের যন্ত্ৰ এই হিসাবে গণ্য করেছে, মানুষ হিসাবে নয়। অথচ জাতীয় স্মৰণীয় ঘটনায়, স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান কোনক্রমেই অবহেলিত ছিল না।

(২) নারীর প্রতি বিধি-বিধান: পুরুষ নারীর প্রতি বিধিগুলি তৈরি করেও অবস্থানের পরিবর্তন করেছে। যেমন বিধবাবিবাহ, সহমরণ, গোত্র-জাতের চিন্তা, বাল্যবিবাহ, ঘাটের মুকাবা সাথে বিবাহ দেওয়া শুধুই জাত-ধর্ম টিক রাখার জন্য। অর্ধাং সমাজ-সংসারের জন্য পুরুষ জাতির কি কি করণীয় তা তাদের সুবিধামতই হচ্ছে। সেখানে নারীর নেতৃত্ব নেই, কোন মতামত দেওয়ার সুযোগ ছিল না। নারী পুরুষ কাজের সম-অধিকার সংস্কৃতি চৰ্তাৰ কোন বিধান থাকল না।

নারীর শত্রু-মিত্র অবস্থানের জন্য দায়ী: নারীর শত্রু নারী একথা সত্য কিন্তু কেন সত্য তা অনেকেই ভেবে দেখেন না। এর কারণ সেই পুরুষের ক্ষমতা, অন্যায় ও অত্যাচারের শাসনের জন্য শিশুকাল থেকেই একটি কন্যা সন্তানকে শেখান হয় অন্যায় হলে প্রতিবাদ করো না, আন্তে কথা বল, পুরুষকে তথা সমাজকে ভয় করে সবসময় সবকিছু মেনে তাদের তুট কর।

সতী নারী হয়ে সমাজ ও নিজেকে কলঙ্ক মুক্ত রাখ, নারী যেহেতু নারীকে এ কথাগুলো শেখায় তাই একজন অপরজনকে শক্ত চিহ্নিত করে। কন্যা ও পুত্র সন্তানের প্রভেদের দেয়াল গড়া, শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র সবকিছুর ব্যাপারে পুত্রকে প্রাধান্য দেওয়া। পুত্র সন্তান হলে জোড়ে আয়ান দিয়ে শুরুতেই তার বল ও মর্যাদা বাড়ান আর কন্যা সন্তান হলে আস্তে আস্তে আয়ান দিয়ে ভীরুতা, জড়তা ও দুর্বলতা ছোটবেলা থেকেই বাড়িয়ে আপনজন শক্তির কাজ করেন। ক্রমশ নারী-পুরুষের সম-অধিকারের ব্যবধান বাড়িয়ে তোলা হয়। তাই এবার আমাদের নারী দিবসের শ্লোগান “নারী পুরুষের সমতা”।

সম-অধিকার থেকে বাধিত করে দেশ, জাতি একটি সুন্দর জাতির ভবিষ্যৎ উন্নয়ন পিছিয়ে যাচ্ছে। উন্নতি করেছে বা করছে সেইসব জাতির দিকে তাকালে দেখি তাদের সম-অধিকার আছে। একজনে নারী পুরুষ চার পায়ে হেঁটে কর্মক্ষেত্রে এগিয়ে চলছে তাই তাদের দুই পায়ের দুই হাতের বদলে চার পা-চার হাতের কাজের গতিও বেড়ে যাচ্ছে।



সামুর সাথে জাতিসংঘ, নিউইয়র্কে আমি



বড় আপার সাথে আমি

তাই বলতে ইচ্ছে করছে “নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিব সম-অধিকার”।

অবস্থানগত কারণে নারী-বেচ্ছায় অনিছ্যায় কিছুটা পরাধীনতা সংসারের শাস্তি, সন্তানের মঙ্গল কামনায় মেনে নিচ্ছে। কারণ আমরা যারা

ভাগ্যবতী সমাজে মর্যাদার স্থানে আছি তারপরও কিছু অলিখিত বিধান আছে এটা কর না ওটা কর না কারণ তুমি নারী। সামাজিক বাঁধা-ধর্মীয় বাঁধা ও ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের বাঁধা, সর্বক্ষেত্রে নারীকে জবাবদিহিতার মধ্যেই থাকতে হয়। সে যত বড় মাপের কর্মজীবী মহিলা হন না কেন? কখনও স্বামী কখনও শুশুর-শাশুড়ী অথবা সন্তানের কাছে, অবস্থানগত কারণে জুতা সেলাই থেকে চাঁপাঠ করলেও কোথায় ভুল বা কম-বেশি হলেই জবাবদিহিতা করতে হবে সংসারের সব সদস্যের কাছে কিন্তু পুরুষটির বেলায় তার প্রয়োজন হয় না। একটি মেয়ে বৌ হয়ে নতুন সংসারে আসার পর তার প্রতি সহানুভূতির হাত না বাড়িয়ে তার ভুল ধরা এবং ভাল কাজে আশা করা অনেকটা শক্তির মতই মনে হয়। কেহই খোজ রাখে না এই মেয়েটি তার পরিবেশে এতগুলো বছর কাটিয়ে নতুন পরিবেশে তার কেমন গাগছে এবং স্বামী দেবতা যদি হল কর্মব্যক্ত উদাসিন পুরুষ তবে তো সোনায় সোহাগা, বিপর্যয়ের কষ্টের আর সীমা থাকে না। পুরুষ তার আধ্যাত্মিকতা বজায় রেখে ভাবেন সব কথা ঘরের মানুষটিকে বলার প্রয়োজন নেই এতে করে মেয়েটি দিনে দিনে কষ্টে অপমানে সংসার তথা স্বামীর কাছ থেকে দূরে সরে গেল সে হিসাব কেহই রাখে না।

ছোট ছোট ভালবাসায় নারী-পুরুষের অবস্থান কত চমৎকার মজবুত হয় সেটা ভুললে চলবে না।

নারী-পুরুষের শ্রম মূল্যের বৈষম্যের অবস্থান:

বেগম রোকেয়ার উক্তি দিয়েই বলছি, “আমরা সমাজেরই অধি অঙ্গ, আমরা পড়িয়া থাকিলে সমাজ উঠিবে কি রূপে, কোন এক পা বাঁধিয়া রাখিলে সে খোড়াইয়া কতদূর চলিবে? পুরুষ জাতির স্বার্থ ও নারীজাতির স্বার্থ ভিন্ন নহে। একই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ। তাই শ্রমের মূল্যায়নের ঘরে বাইরে মেধা ও দক্ষতার মাধ্যমেই নারীর অবস্থান থাকা উচিত। দুর্বল, অলস, অদক্ষ নারী ও পুরুষ সকলের বেলায়ই মাপকাটি একই হওয়া উচিত, জাতীয় পুরক্ষারের বেলা অনুপাত ১০:১-২ অথচ অনন্য পুরক্ষার ১০জন বরেণ্য নারী পেলেন কেমনেও বিয়ের ব্যাপারে মেয়েদের দাঁত, চুল, ইঠা না দেখে উভয়ের যোগ্যতা, শিক্ষা ও গুণাবলি দেখা উচিত।

অনেক পিতা-মাতা মনে করেন পুত্র ভবিষ্যতে আর্থিক সাহায্য করবে। তাই সংসারে তার মূল্যটা বেশি অর্থাৎ স্কুল, কলেজ, অফিস থেকে বাসায় ফিরলে আদর যত্নের বৈষম্য প্রকটভাবে দেখা যায়। বিয়ে দিয়ে অনেক পিতা-মাতা দায়মুক্ত হন কেন? মেয়েদের কোন অবস্থান পূর্ণতা ও স্থায়ীত

পাছে না কেন? বিয়ের পর মেয়েটির সাজানের ঘরটি (বাবার বাড়ীর) অন্যের দখলে চলে যায়। অতিথির মত আচরণ করা হয়। একগুচ্ছ মন-মানসিক পরিবর্তন হওয়া দরকার।

এবার আর বৈষম্যের পাছ্টা ভারি না করে কিছু পরামর্শ নারী-উন্নয়নের জন্য আলোচনা করা যাক:-

- (১) দেশের সবন অনুযায়ী (১৯৯৭) নারী-পুরুষের কোটা বৈষম্য দূর এবং সম-অধিকার প্রণয়ন করা।
- (২) পারিবারিক সম্পদ, ভূমি, ঢাকুরি, সন্মানের ক্ষেত্রে যোগ্যতার মাপকাঠিতে সুযোগ দেওয়া, সম-অধিকার যোগ্যতার বলে নিচিহ্ন করা।
- (৩) জাতীয় ও স্মরণীয় ঘটনায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- (৪) মুক্তিযুক্ত এবং বিশেষ সম্মননাজনক কাজ ও অবস্থানের জন্য স্বীকৃতি দিয়ে পুরস্কার করা।
- (৫) পারিবারিক আইন জোরালো করা, চেতনার উৎক্ষৃতা মাঝে চিন্তার উন্নয়ন ও পরিবর্তন আনা।
- (৬) সামাজিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি উদারতার মাধ্যমে পরিবর্তন আনা।
- (৭) বিয়ের পর শৃঙ্খল বাড়ী আসল বাড়ি একথা বলে মানসিক গুণ সৃষ্টি না করা।
- (৮) বিয়ে দিয়ে পিতা-মাতা দায় মুক্ত এ কথার পরিবর্তন আনা।
- (৯) দক্ষতা ও কর্তব্য বাড়ানোর চর্চা পারিবারিকভাবে উৎপাদন দেওয়া।
- (১০) অলসতা ও অকর্মন্যতা বর্জন করে নিজের ঘূর্ম নিজের ভাঙাতে হবে।
- (১১) বিনা-পঞ্চসার দাসী এই ভাবনার পরিবর্তন আনতে হবে।
- (১২) কণ্যা-পুত্রের মধ্যে আদর, যত্ন, শাসন সঠিকভাবে বন্টন করা।
- (১৩) নারী নির্যাতনের প্রতিকারে “স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল ও পারিবারিক আচার-আচরণের পারিবারিক আদালতের” ব্যবহার নিশ্চিত করা, ৮ মার্চ ১৯৮৮ উন্নয়ন নীতি ঘোষণার প্রেক্ষিতে নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণ।
- (১৪) নারীকে শিক্ষা-দীক্ষায় সংগঠিত করে সফলতার দ্বার খুলে দিতে হবে। দক্ষতা ও আস্থাশীল হতে হবে।
- (১৫) নারীর চোখে বিশ্ব দেখতে হবে।

আমি আশাবাদী এই যে, আজকে আমরা সেবিনারে একথাঙ্গলো তুলে ধরতে পারছি এটা ও অধিকার এবং অর্জন করা অধিকার। পিছন ফিরে তাকালে বরেণ্য নারীর তালিকা দেখতে পাই তারা হলেন-মাদার তেরেসা, ফ্রেরেন্স, নাইটিসেল, বেগম রোকেয়া, বেগম ফজিলাতুন্নেজা, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান, বৃটেন, ইতিয়া, শীলক্ষণ প্রধানমন্ত্রী, এছাড়া অসংখ্য লেখক সাহিত্যিক, রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, যোদ্ধা সুলতানা রাজিয়া ফ-মহিমায় নিজেদের বিকশিত করে স্মরণীয় বরণীয় হয়ে আছেন। টানে যাওয়া থেকে মাটি কাটা সর্বক্ষেত্রে নারীর বিচরণ অস্বীকার করার কিছু নেই। এবার অনন্যা ১০ শীর্ষ তালিকার বিভিন্ন কৃতিতে যারা পুরস্কৃত হয়েছেন তাঁরা সকলেই দক্ষ এবং বিচক্ষণ।

“স্ত্রী জাতির অবনতি” থেকে নেয়া-জগতের যে সকল সমাজের পুরুষেরা সঙ্গীসহ অঞ্চল হচ্ছে তাঁরা উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হতে চলেছেন?

নারীর ভিতর অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষিত পুরুষ নারী শিক্ষার মর্যাদা যথার্থভাবে উপলব্ধি করতে পারে। পরিশেষে আমরা এই শিখনিতে পুরুষ জাতির উপর কোন বিষয়ে নেই আছে তাদের স্বার্থপরতা লোভ, নির্যাতন ও নীচু মনের চিন্তার উপর আসুন তাই ঘর, আঙিনা কর্মক্ষেত্রে নারীর বিচরণ মজবুত ও দৃঢ় করি এবং সংগঠিত হই।

কল্যাণ ও শান্তির জন্য নারী জাগরণ ও সম-অধিকার ভীষণভাবে প্রয়োজন নারী জাগরণের পথিকৃত বেগম রোকেয়ার একটি উদ্ভৃতি দিয়ে শেষ করছি। “আমরা অকর্মণ্য পুতুল-জীবন বহন করিবার জন্য সৃষ্টি হই নাই, এ কথা নিশ্চিত। চক্ষু বগড়াইয়া জাগিয়া উন্নুন-অঞ্চল হউন। বুক টুকিয়া বল মা, আমরা পত নই। সকলে সমস্তরে বল আমরা মানুষ।”

সুবেহ সাদেক ও স্ত্রী জাতির অবনতি (সংগ্রহ)

গার্হস্থ্য অর্থনীতির গুরুত্ব

গার্হস্থ্য অর্থনীতি বিষয় সম্বন্ধে এই আধুনিক যুগেও বেশ ভুল ধারণা পোষণ করেন কোন কোন শিক্ষিত মহল। তাদের ধারণা গার্হস্থ্য অর্থনীতি শুধু রান্না-বান্না এবং উদের পৃত্তি করা ও তত্ত্ব টেকুর তোলা যাদের এই বিষয়ে উপরোক্ত ধারণা তাদের উদ্দেশ্যেই আমার লেখা।

জীবন ভিত্তিক কোন বিষয়ের নাম জিজ্ঞেস করলে যে নামটি সর্বাঙ্গে আসে তা হলো গার্হস্থ্য অর্থনীতি, প্রথমে আমাকে বিষয়টির মূল চারটি ভাগের নাম জানাতে হবে।

গৃহ পরিচালনা, বস্ত্র পরিচ্ছেদ, খাদ্য পুষ্টি, শিশু পরিচালনা।

তাহলে চলুন আমরা উপরোক্ত বিষয়ের গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করি। গৃহ পরিচালনা বলতে বুঝায় গৃহের সামগ্রিক সম্পদ (অর্থ, সময়, সুন্দর সাবলিলভাবে প্রয়োগ ও পরিচালনা করে একটি পরিবার তদেশকে কল্যাণমূখি উন্নয়নে সাহায্য করা। বাজেটের মাধ্যমে, অনুশাসিত পরিকল্পনা করে সময়ের অপচয় রোধ করে ২৪ ঘণ্টা শৈথিল্যের ও অলসতা দূর করে নিয়ন্ত্রণে আনা। শক্তির অপচয় করে



মিহিরের গায়ে ইলুদে মায়ের সাথে আমরা

পরিশ্রম ও শ্রমের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ করা হাসি ও আনন্দে সুষ্ঠু সুন্দর জীবন যাপন করা। এর পরে আসা যাক শিশু পরিচালনা। অনেকের ধারণা শিশু এমনি বর্ধিত হচ্ছে তার আবার পরিচালনা কি? তাহলে ভাবুন শিশু সুন্দর জীবন যাপন করছে না কেন? আমার উত্তর, সময় অনুযায়ী শিশুটিকে সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক বোধগুলো সচেতন ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়নি। ভুল মিথ্যার ভিত্তির পার্থক্য সুস্থি-সুন্দর একটি মানুষ তথা সুনাগরিক গড়ে তোলার বিষয় শিশু পরিচালনা বিষয়ে সমাজ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা থেকে আমি নিশ্চিত শিশুদের অভাববোধ মিটে সুন্দর উন্নত ভবিষ্যৎ হবে।

এরপরে আশা যাক খাদ্য পুষ্টি এই বিষয় নিয়ে অনেক শিক্ষিতজন Under estimate করে। একটি ভোজের অনুষ্ঠানের আয়োজন করলে তখন সকলের দৃষ্টি থাকে খাদ্যের উপর। খাদ্যের মান, পুষ্টি জ্ঞান, সুব্যবস্থা, খাদ্য পরিকল্পনা, টেবিল ম্যানারস, খাদ্যকে আকর্ষণীয় করে তোলা, কম পয়সাসাথ খাদ্যগুণ বজায় রেখে আয়ের মধ্যে বাজেটে সীমাবদ্ধ থেকে আপ্যায়নের আনন্দে (Well coming face) ইত্যাদি দিকে করার কোন নজর থাকে না। অথচ জীবন প্রবাহে মানুষের সীমাবদ্ধতা এই ধরণের একটি ভোজের আয়োজনকে আকর্ষণীয় করা কত কষ্টের তা' একবারও কেহ ভাবে না। আরও আছে এ বিষয়ে বিভিন্ন বয়স, অসুস্থ রোগীর খাবার তালিকা, খাবার সংরক্ষণ করা শ্রমের উপর শক্তি ফ্রয় এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে ক্যালোরি পরিমাপ করে খাদ্য তালিকা করা। গর্ভবতী মায়ের খাবারের প্রতি বিশেষ স্বাস্থ্য সম্মত নজর রাখা, প্রাথমিক চিকিৎসা, সংক্রামক ব্যাধি থেকে রক্ষা করা, রোগী ও বৃক্ষ এবং শিশুদের বিশেষ যত্ন নেওয়া।

ভিটামিন ও খনিজ পদার্থের প্রয়োজন জানা এবং ভবিষ্যতে বিভিন্ন বৃক্ষকালীন অসুস্থ্যতা প্রতিরোধ করা। হাসপাতালের ছাত্র-ছাত্রী নিবাস অথবা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, মানুষের সংখ্যা ও অর্ধিক লক্ষ্য রেখে খাবার আয়োজন করা। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানের কাজ, উৎস ও প্রয়োজনীয়তা জেনে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে খাদ্য তালিকা করা। আমার মনে হয় এর পর নিচ্যই কেহ একথা জিজ্ঞেস করবেন না যে, আপনাদের রান্না-বান্না কবে হবে?

এর পরে আশা যাক বস্ত্র পরিচ্ছেদ বিষয়ে। সভ্যতার উন্নতির সাথে সাথে এই বিষয়ের গুরুত্ব অনস্থীকার্য। এখানে আমরা বিভিন্ন বস্ত্রের

উপাদান ও শিল্পের উপাদান সম্বন্ধে জানতে পারি। বৃং রেখা, বিভিন্ন ছাট-কাট সবুজে জানতে পারি। কাপড়ের উপর কোন ধরণের জিনিস যেমন কালি, বোল, চা, রক্ত ইত্যাদি লাগলে তা কিভাবে উঠান যায়। বিভিন্ন খাতুতে কাপড়ের যত্ন নেওয়া, নিজেকে আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিগত করে তোলা। কোন ধরণের অনুষ্ঠানে সময় অনুযায়ী পোশাক, ব্যাস অনুযায়ী পোশাক নির্বাচন তার নির্দেশ থেকে সৌন্দর্যজ্ঞান অর্জন করা যায়। এই বস্তু পরিচেছে বিষয়ে।

তাহলে আশা করি গাইস্ট্য অর্থনীতি রাস্তা-বাস্তা এই ধারণা করে বিষয়টিকে অবমূল্যায়ন করে অঙ্গতার পরিচয় দিবেন না। প্রতিটি বিষয়ের স্ব-স্ব ভূমিকা আছে বৱৎ জীবনের প্রয়োজনে সকাল-সন্ধ্যা, জন্ম-মৃত্যু পর্যন্ত যে বিষয়টির প্রয়োজন তা হল গাইস্ট্য অর্থনীতি। সুতরাং বিষয়ে সুষ্ঠু সুন্দর পরিমার্জিত জ্ঞান রাখা দরকার। কারণ এই বিষয়টির প্রতিটি স্তর প্রত্যক্ষভাবে মানুষের জীবনের সাথে সম্পৃক্ত।



সামায়রা ও আমি

সুখ কি?

যুগ যুগ চিন্তা করে আজো মানুষ সুখের কোন সজ্ঞা দিতে পারেনি। কিন্তু সুখ কি সত্যিই আমরা বুঝি না? নাকি ধরতে পারি না। সুখ-শান্তি-স্বত্তি এ সবই কিন্তু অনুভূতির ব্যাপার। তাই একে মাপা যায় না বিশ্বেষণ করা যায় না এমন কি স্পর্শ করা যায় না। এতই যদি অলৌকিক হয় তবে আমরাই কিন্তু বলি তোমার মেয়ের পর সুখে আছে? উত্তর আসে জি আচ্ছাহৰ রহমতে মেয়ে আমার সুখে আছে।

প্রশ্ন হল সুখ যদি এতই অদৃশ্য তবে আমরা জানতে চাই কেন সুখে আছে কিনা? আমি অনেক ভেবে দেখলাম সুখ একটি অনুভূতি যে অনুভূতি মানুষকে আনন্দ দেয়, শারীরিক সৌন্দর্য বর্ধন করে, মন মানসিকতা সারিত করে, কাজে কর্মে স্পৃহা যোগায়, আচরণে চমৎকারিত বর্ধন করে তাদিন সহিতশৃঙ্খল। যখন কোনো মানুষের ভিতর উপরের ব্যাপারগুলোর অঙ্গপ্রকাশ ঘটায় তখন আমরা বলি অমুক সুখে আছে। এগুলির অভাব বোধ হলে আমরা তাকে অসুখি বলি। আরো একটি ব্যাপার সুখের সাথে জড়িত তা হল স্বত্তি। কারও স্বত্তি বা শান্তি না থাকলে সুখ হয় ক্ষণস্থায়ী।



বড় ভাই ও বড় ভাবী

অস্তি-অসুখি-অশান্তি এই তিনটি শব্দ ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সকলের জীবনে। এই শব্দ তিনিকে যদি পরিত্যাগ করতে পারে তবেই আসবে সুখ-শান্তি-স্থিতি।

তা হলে চলুন এই সুখ আনতে হলে প্রয়োজন কি দেখি। অনেকেই বলে আরে ভাই টাকা থাকলেই সুখে থাকা যায়। তাই যদি হয় তা হলে পৃথিবীর ৯০% ধনী পরিবার অসুখি কেন? অনেক সময় অধিক অর্থ কিন্তু মানুষের সুখ হরণ করে। কারণ অর্থ মানুষের মনোবল বাড়ায়। থারাপি কাজকে ভয় পায় না। কারণ আত্মগরিমা অহঙ্কার বেড়ে যায়, যা খুশি তাই করে। ড্রাগ, জুয়া, মদ বেপরোয়া জীবন-যাপন ফলাফল 'এইডস' আবার অর্থের অভাবে অবৈধ কাজকে ভয় পায় না। ফলাফল বহু বিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদ, পরিকিয়া প্রেম, হাইজাকারে ঝুপাতরিত হওয়া।

তাহলে সুখ কি পাব না? আমার মনে হয় একটু চেষ্টা। যম, সহানুভূতি, বিশ্বাস, স্নেহ-ভালবাসা, অপব্যায় রোধ, চারিত্যিক তা, নির্লোভ হওয়া এগুলো যদি মানতে পারি তবেই সুখ পাখী নিজেই সে খেলে লাল ঠোঁটে হাসি করিয়ে বলবে, আমি এসেছি তোমাদের সাথে কর বলে। সুখ কিন্তু ভীষণ অভিমানি জীবন চলার পথে একটু এলাকা করে হলেই সে ঘূড়ি।

"সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে" কিন্তু কথাটি হওয়া দর্শার গার সুখের হয় সকলের মিল-মিশে"। যেমন ধরণ আজকাল প্রা-কল পরিবারের মধ্যে অনেক কাজ করেন। যদি কর্মজীবী কোন মহিলার ঘরে ফিরতে একটু দেরী হয় তাহলে হাজার প্রশ্ন। ভাবখানা এমন সংসারের কাজ ফেলে খেয়ে আড়া বা হাওয়া খেতে গিয়েছি। অথচ পুরুষের ফিরতে দেরী হলে কিছু জিজেস করলে আদর-আপ্যায়ন করার পর মেজাজ বুঝে তবে। উত্তরে এমন একখানা ভাব আসবে দেরীটা তার সৌন্দর্যের অলংকার। তাহলে অসম এবং অ-অনুপাতিক ব্যবহারে সুখ আসবে কি করে? নারী তুমি যতই চাকরী কর ডালে লবণ কম হলে বা রুটি একটু ছোট কেন? মাথন নেই কেন? কেন মাছে হলুদের গুঁড়? বাচ্চার পরীক্ষার ফলাফল থারাপি হলে বা মেহমানদারীতে একটু কমতি হলে সব একাধারে সেই নারী দেখী। উটো হলে কিন্তু অন্য রকম। যেমন আরে রহমত সাহেবের বাসার মেহমানদারীর তুলনা হয় না উদার, কলিজা বড় ইত্যাদি। কিংবা রহমত সাহেবের ছেলে মেয়ে পড়াওনায় খুব ভাল। পুরুষ যদি একটু সংবেদনশীল

হয় যেমন তার স্ত্রীর হঠাতে আসায় হাসিমুখে এককাপ চা নিজে না বানিয়েও যদি বলে মরিয়ম তোর বিবি সাহেবকে তাড়াতাড়ি এককাপ চা দে। কিংবা বলতে পারে... ইস তোমাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে... চল আজ শুধু আলু ভর্তা বা ডিম ভাজা দিয়ে থাই। তুমি একটু রেস্ট নাও। তখন যে অনুভূতি হয় সেটাই সুখ। সুখ কেন অচেনা কিছু নয়। এটা সুক্ষ্ম অনুভূতি... অনেকটা কোরামিনের (ঔষধ) কাজ করে। নারী-পুরুষ-সন্তান সকলেই যদি সকলকে সম্মান ভালবাসা অনুভব করে সেই সংসারেই সুখ আসে। সুখের ভাভার অফুরন্ত। তবে ব্যবহারের ওপর এটা বাড়বে করবে। মানুষের আচরণে যদি চমৎকারিত থাকে, হিংসা লোভ বর্জন করে, কথা-বার্তার ভদ্রতা অন্তরঙ্গতা থাকে। প্রতিটি কাজে বুত না ধরে মিলে মিশে থাকলেই সুখ সুখি হয়। ভালবাসার মৃত্যু সুখের বিদায়। ভোগে সুখ নেই। বরং হাসি-শুশি ভদ্র আচরণে সুখ আসে।

আসুন এই ছোট জীবনে বাজে রুচি ব্যবহার করে জীবনের প্রম পাওয়া সুখকে অবহেলা না করে বরং একে লালন করি। পরবর্তী বংশধরদের এটা উপহার দেই, শেখাই তবেই পৃথিবীর শান্তি সুখ ভরপূর হয়ে উঠবে। মানুষ আত্মবিশ্বেষণ করতে শিখবে নিজের ভূলের জন্য নিজেই দুঃখিত লজ্জিত হবে সংশোধন হবে। মারামারি-হানাহানি-ধ্বংসের যুদ্ধ, ব্যাভিচার থেকে সকলকে আহ্বান করি কি হবে অসুখি হয়ে? আমরা ত কেহই অনন্তকাল বেঁচে থাকব না কিন্তু শৃতি বেঁচে থাকবে। তা যেমন হিটলারের শৃতি মানুষ ঘৃণাভরে মনে করে আবার মাদার তেরেসাকে কত মহিমা ভরে মনে করে। সুন্দর হলে দুঃখ-কষ্ট সোনালী আবীর রঙে হাসবে। সুখকে আহরণ করুণ অন্যকেও সুখি করুণ। তা হলে সুখ লুকোচুরি করবে না।



১৪তম জন্টা কনভেনশন



পিতা ও কন্যা

মধ্য বয়সের সমস্যা

কথাটা শুনলে অনেকেই অবাক হয়ে যাবেন। কত সমস্যার কথা শুনা গেল, যেমন আর্থিক সমস্যা, শারীরিক সমস্যা, সামাজিক সমস্যা কিন্তু উপরোক্ত সমস্যার কথা কখনও শুনা যায়নি।

অনেক ভেবে লিখতে বসলাম, বয়সের সাথে সাথে মানুষের অনেক রকম শারীরিক ও মানসিক সমস্যা দেখা যায়। আমরা অনেক সময় খেয়াল করিনা মানুষের জন্য থেকে বৃদ্ধকাল পর্যন্ত আমরা কয়েকটি তারে ভাগ করতে পারি। শিশুকাল, বাল্যকাল, কৈশরকাল, যৌবনকাল, মধ্য বয়স ও বৃদ্ধকাল। এই বিভিন্ন স্কুলের শ্রেণীর মত বিভিন্ন শিক্ষা ও সদৃশ সমাধান দেওয়া আছে।



দুই বোন সোমা ও সুধী

অনেক ভাববেন বড়দের সমস্যা অনেক রকম যেমন-শারীরিক হরমোনাল সমস্যা ৪০-৪৫ বছরের মধ্যে মহিলাদের মোনেপজের মাধ্যমে মাসিক বৃক্ষ হরো যাওয়ায় শারীরিক ও মানসিকভাবে কিছুটা পরিবর্তন দেখা দেয়। কেহ আছেন ব্যক্তিময় জীবনের মধ্য থেকে এই ব্যতিক্রম তেমন

একটা অনুধাবন করেন না। আবার অনেকে এই পরিবর্তনকে সুন্দর প্রসারী সমস্যার সৃষ্টি করেন। মাথা গরম বা ফ্ল্যাসিং ইওয়ায় খিটখিটে মেজাজ আচরণের সব সময় বিরক্ত এবং রাগার্বিন থাকেন। অনেক মহিলা ভাবেন তার বুবি আর স্বামী সঙ্গ রইল না। এই সময় অনেক স্বামী-স্ত্রীর মিলনের সমস্যা মনে করেন। আসলে বেশীর ভাগ সমস্যা মানসিক তাই সেটাই স্বামী-স্ত্রীর মিলনে তাঁক্ষণিক কিছুটা সমস্যার সৃষ্টি হলেও এটা কোন বড় সমস্যা নয়। স্বামী-স্ত্রীর স্বর্গীয় মিলন সব সময় প্রয়োজন নিষ্পাপ ভালবাসা, আনন্দিতা, আনন্দময় পরিবেশ। মানুষ একজন অন্যজনকে গুরুত্ব দিলে অন্যজন খুশ থাকে সমানিত হয়। এইভাবে একটা পরিবেশ শান্তি-সুখ জীবন আনন্দ ধারা প্রবাহীত হয়। এতো গেল একটি দিক, ৪০-৪৫ বছর এটার সাথে সংযুক্ত হয় সময়, সময়-ব্যৱস্থা। সেটা জীবনের চলমান প্রবাহ কিন্তু সময় কাটে না কোন কিছু করার থাকে না। সন্তান বড় হয়ে যায় সংসার-কর্মজীবন সবকিছু কেন যেমন শুবীর হয়ে যায়। জীবনের হিসেবে-নিকেশ সম্মুখে এসে উঠি মেরে যায়। কিছু আনন্দের বেশীর ভাগ না বৰ্ধনের সৃষ্টি। তখন নিজেকে খুব অসহায় মূল্যহীন মনে হওয়ায় বেঁচে থাকার স্পন্দ্র-আনন্দ থমকে যায়। যান্ত্রিক জীবনে মানুষ যে কোন কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে। এছাড়া গাঢ়ীর মত মানুষের জীবন বিভিন্ন যন্ত্র ক্রমশঃঃ ক্রয় হয়ে কিছুটা বিকল হয়ে যায়।

এরপর আসা যাক সামাজিক ও আর্থিক। এই মধ্য বয়সে আয়ের প্রোত্তে কিছুটা ভাটা দেখা দেয়। যার প্রথম জীবনে হিসেব করে কিছু সন্ধিয় করে ভবিষ্যতের জন্য রেখেছেন তাদের চাইতে কটে পড়ে যারা সর্বস্য সন্তান-সংসারের জন্য খরচ করে নিঃস্ব দেওলিয়া হয়ে মধ্যজীবনে উপগিত হয়েছে, তাদের সামনে-পিছনে শুধু হাহাকার-বৰ্ধনা-ব্যৰ্থতা। যারা অনেক ভাগ্য করে এসেছেন তারা হ্যাত সন্তানদের কাছ থেকে সম্মান ভালবাসা-শৰ্কা পান। বেশীর ভাগ যে হাত দিয়ে সন্তানকে খাওয়ান, পড়ান, হাঁটাতে শিখিয়েছেন সেই হাত এক বটকায় সরিয়ে নিজেদের সময়-জীবন নিয়ে ব্যক্তিগত বর্তমান নিয়ে ঝুঁটে চলে সন্তানরা।

জীবনটা অনেকটা জুয়া খেলে হার-জিতের মত। তুরলপের তাস যার হাতে সেই জয়ী। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রাতের ঘুম হারাম করে সন্তান-সংসারকে শেষ স্টেশন পর্যন্ত এনে তাকিয়ে দেখে শুধু ইঞ্জিন আলাদা হয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে। তার গন্তব্য ঠিক হবে তার ক্ষমতার উপর নয়, বগীর

প্রয়োজনে যাত্রীর উপর। নির্ভর করবে, অর্থাৎ যাদের উপর নির্ভর করে ধাকবেন তাদের উপর নির্ভর করবে।



ইউএসএ আলফর সাথে আমি



লুচিয়ানা টেক্সেস

এতো গেল কিছুটা মধ্যবয়সী মহিলাদের সমস্যা। পুরুষ সমস্যা আরও বেশী-প্রথমঃ পুরুষদের অনেকে মনে করেন জন্মাচার অধিকার ক্ষমতাবান হয়ে সর্ব বিষয়ে নিজেদের প্রথম এবং উচ্চামাত্রার অধিকারী ভাব। অনেক শিক্ষিত-অশিক্ষিত পরিবারে বাড়ীর উপার্জন ক্ষমতাবান পুরুষের ন্যায় হোক, অন্যায় হোক শেষ কর্তৃ।

এই সকল ব্যক্তিক পুরুষত্বের সমস্যা অনেক সময় প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। সেসব পুরুষের ধারণা তারা তাদের পৌরুষত্বের ক্ষমতায় সকলকে শাসন বা তার কথামত চলতে বাধ্য করবে। তারাই যখন হরমোনাল সমস্যায় মধ্যবয়সে ক্ষমতার ভাড় বহন করতে পারে না, নিজেকে খুব অসহায় ভাবে তখন তাদের আচার-আচরণ দুই ধরণের হয়। একদল খুব গোবেচারা অসহায় অধিকতর ভদ্র আচরণ করে। অন্য ধরণের দল আরো কঠোর কিছুটা হিন্দু অশ্঵াভাবিক আচরণ করে। নিজেকে Best প্রমাণের জন্য সব কাজে নাক গলায়। প্রয়োজন-অপ্রয়োজন ভুলে এমন অস্তুত আচরণ করে অন্য সদস্যদের অনেক সময় লঙ্ঘায় পড়তে হয়। অনেক আদেশ-নির্দেশ অন্যায়ভাবে অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়। সন্দেহ নামক মানসিক রোগের

শিকার হয়। সবকিছুতে হারাই হারাই ভাব, নিজের শারীরিক দুর্বলতা মেনে নিতে পারে না। দাস্ত্য কলহের কারণ হয়ে দাঢ়ায়। অথচ নারী জাতি মায়ের জাত, আলোচনার মাধ্যমে এই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

সূর্যের প্রথম প্রহরের শিঙ্ক আলো স্বল্প তাপ আরামদায়ক। দুপুরে ফররোদ প্রচও তাপ আবার বিকালে সেই মাধ্যমে পশ্চিমে ঢলে পড়ে নিজেকে সম্পূর্ণ করে নতুন দিনের নতুন আলোর আভাস দিয়ে মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরের কাজ ক্রপাঞ্চরীত হয়ে নতুন বংশধরদের উপর অর্পণ করে। এক সময় সৌম্য শান্ত হয়ে জীবনের সায়েছে এসে বিদায় নেয়। এটা ভুলে গেলে চলবে না, যে সময়টা পেরিয়ে আসি সেটাকে ধরে রাখা যায় না বরং প্রতিটি স্তর থেকে নিজেকে মিলিয়ে সমর্পোত্তা করে শান্তি-সুখময় জীবন রেখে গেলে প্রজন্ম এ থেকে ভাল কিছু ধারণা করতে পারলে জন্ম স্বর্ধক।

পুরুষদের একটা জিনিস বিশ্বাস করা উচিত নারী কি চায়। নারী চায় একটু ভালবাসা, আদর ও সম্মান এবং বিশ্বাস। এতে হিরা-সোনা লাগেনা। ঘরে ফেরার সময় একটি ফুল একটি ছোট্ট উপহার অথবা হাঠাত কোথায় হয় সিনেমা বা কোথায় খেতে নিয়ে যাওয়া এতে কতটা সুখ-শান্তি হয় একবার দু'জনে মনের কথা নিরিবিলিতে আলাপ করণ দেখবেন পৃথিবী স্বর্গ। জোড় করে কঠোর হয়ে আর যাই পাওয়া যায় ভালবাসা সন্ধান, শুন্দা পাওয়া যায় না।



বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন সিলেক্টে আমরা ক'জন

প্রয়োজনে যাত্রীর উপর। নির্ভর করবে, অর্থাৎ যাদের উপর নির্ভর করে থাকবেন তাদের উপর নির্ভর করবে।



ইউএসএ আলফার সাথে আমি



লুচিয়ানা টেক্সেস সাথে

এতো গেল কিছুটা মধ্যবয়সী মহিলাদের সমস্যা। পুরুষদের সমস্যা আরও বেশী-প্রথমঃ পুরুষদের অনেকে মনে করেন জন্ম অধিকার ক্ষমতাবান হয়ে সর্ব বিষয়ে নিজেদের প্রথম এবং উচ্চারণ অধিকারী ভাব। অনেক শিক্ষিত-অশিক্ষিত পরিবারে বাড়ীর উপাজন কর্মতাবান পুরুষের নায় হোক, অন্যায় হোক শেষ কথা।

এই সকল ব্যক্তিক পুরুষদের সমস্যা অনেক সময় প্রচণ্ডভাবে দেখা দেয়। সেসব পুরুষের ধারণা তারা তাদের পৌরুষত্বের ক্ষমতায় সকলকে শাসন বা তার কথামত চলতে বাধ্য করবে। তারাই যখন হরমোলাল সমস্যায় মধ্যবয়সে ক্ষমতার ভাড় বহন করতে পারে না, নিজেকে খুব অসহায় ভাবে তখন তাদের আচার-আচরণ দুই ধরণের হয়। একদল খুব গোবেচোরা অসহায় অধিকতর ভদ্র আচরণ করে। অন্য ধরণের দল আরো কঠোর কিছুটা হিন্দু অস্বাভাবিক আচরণ করে। নিজেকে Best প্রমাণের জন্য সব কাজে নাক গলায়। প্রয়োজন-অপ্রয়োজন ভুলে এমন অস্তুত আচরণ করে অন্য সদস্যদের অনেক সময় লজ্জায় পড়তে হয়। অনেক আদেশ-নির্দেশ অন্যায়ভাবে অন্যদের উপর চাপিয়ে দেয়। সন্দেহ নামক মানসিক রোগের

শিকার হয়। সবকিছুতে হারাই হারাই ভাব, নিজের শারীরিক দুর্বলতা মেনে নিতে পারে না। দাম্পত্য কলহের কারণ হয়ে দাঢ়ায়। অথচ নারী জাতি মায়ের জাত, আলোচনার মাধ্যমে এই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়।

সূর্যের প্রথম প্রহরের শিঙ্ক আলো বল্প তাপ আরামদায়ক। দুপুরে ক্ষররোদ প্রচণ্ড তাপ আবার বিকালে সেই মাধ্যমে পঞ্চিয়ে চলে পড়ে নিজেকে সম্পূর্ণ করে নতুন দিনের নতুন আলোর আভাস দিয়ে মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরের কাজ রূপান্তরীত হয়ে নতুন বংশধরদের উপর অর্পণ করে। এক সময় সৌম্য শান্ত হয়ে জীবনের সায়ছে এসে বিদায় নেয়। এটা ভুলে গেলে চলবে না, যে সময়টা পেরিয়ে আসি সেটাকে ধরে রাখা যায় না বরং প্রতিটি স্তর থেকে নিজেকে মিলিয়ে সমবোতা করে শান্তি-সুখময় জীবন রেখে গেলে প্রজন্ম এ থেকে ভাল কিছু ধারণা করতে পারলে জন্ম সার্ধিক।

পুরুষদের একটা জিনিস বিশ্বাস করা উচিত নারী কি চায়। নারী চায় একটু ভালবাসা, আদর ও সমান এবং বিশ্বাস। এতে হিরা-সোনা লাগেনা। ঘরে ফেরার সময় একটি ফুল একটি ছোট উপহার অথবা হঠাৎ কোথায় হয় সিনেমা বা কোথায় খেতে নিয়ে যাওয়া এতে কতটা সুখ-শান্তি হয় একবার দু'জনে মনের কথা নিরিবিলিতে আলাপ করণ দেখবেন পৃথিবী স্বর্গ। জোড় করে কঠোর হয়ে আর যাই পাওয়া যায় ভালবাসা সন্ধান, শুক্র পাওয়া যায়



বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশন সিলেটে আমরা ক'জন

“শিক্ষা হল স্বাধীনতার চাবি বা মূলমন্ত্র”

উপরের উক্তি শব্দে অনেকেই ভাববে এটা এমন কি নতুন কথা, আ, ঠিক এটা পুরান কথা আবার নতুন করে ভাবলে এর অর্থ হবে অন্য রকম।

প্রথমতঃ শিক্ষা কর প্রকার, পুঁথিগত বিদ্যা, জীবন থেকে শিক্ষা, গল্প থেকে শিক্ষা, ইত্যাদি।

শিক্ষিত মানুষ দুই রকম-

১। পাঠ্যগুস্তক পড়ে পরীক্ষা দিয়ে-BA, MA, Doctor, Engineer
ইত্যাদি তাকে আমরা সমাজে সু-শিক্ষিত বলি।

২। আর একদল স্ব-শিক্ষিত যারা-বুদ্ধি, সাহস, ন্যায়, সত্যতা মনের সৎ বিশ্বাসে কাজ করে নির্ভিকভাবে কাজ করে যা দেশের ও দেশের জন্য জীবন দিতে দ্বিধা করে না তারা নি এবং স্ব-শিক্ষিত।

আজ পর্যন্ত যত সাহসের পরিচয় পাওয়া গেছে তা রঞ্জ সমগ্র পৃথিবীতে, কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, নবাব ফরাজুনেছা বেগম, সুলতানা রাজিয়া, বাসির রাণী, বা যোদ্ধা, ব্যবসায়ী আরও অনেক নাম।

এখন আপনারা ভাবেন, তা হলে পুঁথিগত বিদ্যার দর্শন নেই? না অবশ্যই আছে। প্রথমে নিজেকে চিনতে হলে শিক্ষার প্রাথমিক প্রয়োজন আত্মবিশ্বাসের প্রয়োজন। তাহলে আলোকিত মানুষের জীবন-কর্মকাণ্ড জানা যায়, নিজের মনকে সচেতন করা যায়, সাহসী হওয়া যায়। অক্ষর জ্ঞান না থাকলে ভুল পথে বা সঠিক পথ নির্বাচন করা যায় না। তাই আমার বলার উদ্দেশ্য শিক্ষিত হয়ে স্ব-শিক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। বিদ্যান হয়ে যদি সেটার ব্যবহার শুধু বই এর মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি তাহলে চলবে না। নতুন প্রজন্মকে ধারক-বাহক হিসাবে তৈরী হওয়ার পথ করে দিতে হবে।

শিশু জন্মের সাথে সাথে মাঁকে চেনে। কারণ স্পর্শে দ্রেছের ধারা বিশ্বাস স্থাপন হয়, তাই মার কাছে গেলেই কান্না থেমে যায়।

আদর-কায়দা, সম্মান, স্নেহ-ভালবাসা সবকিছুই স্ব-শিক্ষার মধ্যে থাকে। কিছু ভাল কাজ অনুকরণের মাধ্যমে আসে, কিছু ভাল কাজ মনের ভিতর থেকে আসে এবং সেগুলো যখন একত্র হয় পুরী গত বিদ্যার সাথে

আমার লেখা / ৭০



নর্থ-সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বাবা-মার সাথে সুখী

তখন একজন মানুষ আলোকিত হয়, শুন্ধ হয় এবং অন্যকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। প্রথমে কাজটা নিজের দ্বারা সঠিকভাবে করতে হবে তারপর অন্যকে অনুপ্রাণিত করবে। স্ব-শিক্ষা প্রয়োজন আপন আত্মাকে এবং মনের জোর বাড়ান, প্রাক্টিস করা। সু-শিক্ষার প্রয়োজন সঠিক পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। আমরা যখন পুঁথিগত বিদ্যা রঞ্জ করি তখন একটা ভাল চাকরি করি কিন্তু সেই কাজ তখন উন্নতি হবে বিদ্যা-বুদ্ধি-সাহস মূল্যায়ন-সততা ইত্যাদির সমন্বয়ে।

অনেক পরিবারে দেখা যায়, তেমন পুঁথিগত শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত নয়। কিন্তু তার ব্যবহারিক জীবন তাকে সাহসী, সৎ, কর্মঠ, ভদ্রতা, ন্যূনতা আদর্শের আলো দেখিয়েছে। তাই দিয়ে তিনি তার সন্তানদের সুন্দর ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। তাই একটি শিক্ষিত ভালমানুষ সমাজ উন্নয়নের ভীষণ প্রয়োজন।

কথায় আছে,

“আপনারে বড় বলে বড় সে নয়,
লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়”।

আমার লেখা / ৭১

স্পৰ্শ

"স্পৰ্শ" কথাটা ভাবলেই কেমন একটু মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। একটু ভয়, আনন্দ, বিশ্বাস ভাললাগা সব মিলে একটি অনুভূতি। কিন্তু কেন এমন হয় কখনও কি ভেবে দেখেছেন? ইদানিং পত্রিকায় এটা নিয়ে বেশ লেখালেখি হচ্ছে। তাহলে নিশ্চয়ই এই শব্দটির একটু গুরুত্ব আছে।

তাহলে চলুন স্পৰ্শ শব্দটি কি এটাই প্রথমে অনুধাবন করি। মানুষের শরীরে শিশুণ এক প্রকার বিদ্যুৎ পরিবহন। তা এই স্পৰ্শের মাধ্যমেই হয়। মন ছুঁয়ে যায়, আবেগে তড়িত হয়ে পুলকিত হওয়া, কিংবা বিরক্ত-ঘৃণা হওয়া, তাও কিছু স্পৰ্শের মাধ্যমে মন্তিকে সংকেতের কাজ করে। ভয়ে দৌড়ে এসে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কেঁপে উঠা অপর পক্ষের স্পৰ্শের মাধ্যমে থেমে যায় অর্থাৎ অভয় বা বিশ্বাস পায় স্পৰ্শের আন্তরিকতার মধ্যে। তাহলে এক্ষেত্রে দেখা যায়, স্পৰ্শ বিশ্বাস ভাজনে সহায়তা করে এবং ভয় দূর করে।

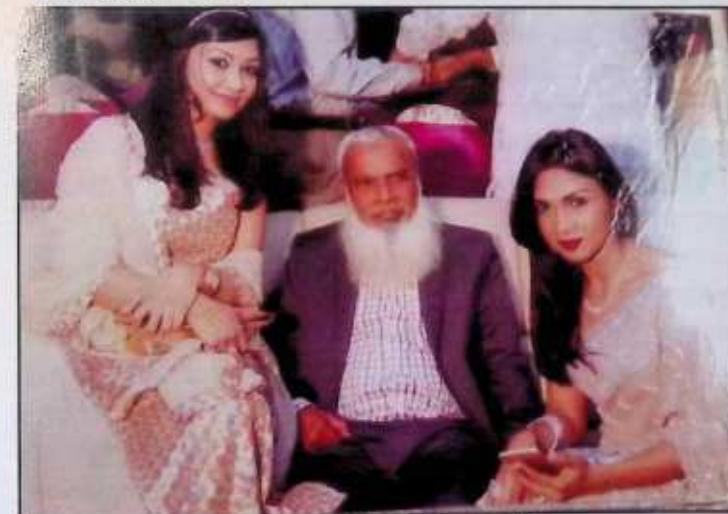
মা-শিশুর স্পৰ্শে স্বর্গীয় যে আনন্দের অনুভূতির সৃষ্টি করে তুলিতে দৃশ্যমান হয়। তবে পুরো ব্যাপারটা দু'টি জীবনের আনন্দের অনুভূতি তা শুধু মা-শিশুই অনুভব করতে পারে অন্য নয়। স্পৰ্শের গুরুত্ব প্রথম ধাপ ইদানিং শিশু ভূমিট হওয়ার সাথে সাথে না করেই মার স্পৰ্শ অনুভব করান হয়। বুকের দুধের আদর্শতা ইতো খুব বেশি প্রচার হচ্ছে এই স্পৰ্শের উপর গুরুত্বের ফল, বুকের দুধের প্রের যেমন বিকল্প নেই তেমন এর মাধ্যমে মা ও শিশুর ভিতর যে একটি নিবিড় বন্ধনের সৃষ্টি হয় তা যেমন সুন্দর তেমন মজবুত। শিশুর বিশ্বাস, মায়া এবং শান্তির সৃষ্টি হয় এই দুধ খাওয়ার সময়। তাই দেখা গিয়েছে সেইসব শিশু স্থির শান্ত, স্নেহ প্রবণ, মার প্রতি আকর্ষণ ও মেধাবী হয়। তাই সুস্থ সুন্দর শিশুর জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমানে বিদেশে শিশুর আলাদা কক্ষ বর্জন করে মার কাছে থাকার অনুমতি দিচ্ছে। শিশুকে এভাবে আলাদা রেখে দেখা যায় সমাজের অঙ্গিতা, ভয়াবহতা বেড়েই যাচ্ছে। তাই শিশুকে মা-বাবার হাজার ব্যক্তার মধ্যেও সময় দেওয়ার উপদেশ-আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

দুঃখ-বেদনা, আনন্দ যাই ঘটুক কিন্তু স্পৰ্শ মহা-উন্মুক্তের কাজ করে। আলোকিকভাবে স্পৰ্শের মাধ্যমে এই অনুভূতির অংশীদার হওয়া যায়। স্পৰ্শের পরশে অদৃশ্য অভয় ও সাহস পাওয়া যায় তা অনুভবের ব্যাপার। আজকাল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যে সব পিতা-মাতা উভয়ে বাইরে দুষ্ট শিশুকে যদি কিছুক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরা যায়, মাথায় হাত বুলান যায়, দেখা

যায় তার অঙ্গিতা-দুষ্টামী কিছুটা প্রশংসিত হয়। ছেট শিশু কাঁদলে দেখা যায় কারোর কোলে কান্না থামছে না কিন্তু মা কোলে নিলেই সে থেমে যায়। কারণ কি জানেন? শিশু প্রথমে স্পৰ্শের মাধ্যমে বিশ্বাস করতে শিখে এবং খাওয়া, প্রাক্তিক কাজে সহায়তা করে তার আরাম দেওয়া সাধারণত মা করেন। তাই তাকেই সে বিশ্বাস করে এবং কান্না থামায়। আসলে আমরা ছেট-বড় সকলেই স্পৰ্শের মাধ্যমে ভালবাসা প্রেছ বুঝাতে চেষ্টা করি, আন্তরিকতা, গভীরতা বুঝা যায় স্পৰ্শের মাধ্যমে। তাই বয়স, সময়, হান-কাল, পাত্র ভেদে এর ব্যবহারের মাধ্যমেই সৌন্দর্য ফুটে উঠে, নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগে সফলতা আসে।

যেমন মা-শিশু স্পৰ্শের মাত্রা সময় জান এক প্রকার, স্বামী-স্ত্রীর গভীরতা স্পৰ্শের মাধ্যমে হয়ে উঠে স্বর্গীয় দাস্ত্র্য জীবন। অবসান হবে পরকীয়া প্রেম তরুণ-তরুণী যেন মাত্রা ছাড়া স্বাধীন স্পৰ্শে কোন অংটন না ঘটায় তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। তাই-বেণু বয়স ভেদে কতটুকু স্পৰ্শের আন্তরিক হবে সেটাও নিয়ন্ত্রিত হবে। তবেই স্পৰ্শের সুফল বয়ে আনবে না বিল আনন্দ।

স্পৰ্শের মাধ্যমেই আমরা ভাল-মন্দের সঙ্গে মন্তিকের ধারণ করি। আদুর, অবহেলা, পরকীয়া সব স্পৰ্শের মাত্রার উপর নির্ভর করবে। হিস্ট্রি ও বস মানে স্পৰ্শের পরশে। তাই আমাদের আগামী দিনগুলি কল্যাণ ও বি-সুন্দর জীবনের ধারক হোক স্পৰ্শ। স্পৰ্শের গুরুত্ব সকলে অনুধাবন বৃল, এই হোক আশা।



পিতার সাথে দুই কল্যাণ সোমা ও সুখী

স্পৰ্শ

“স্পৰ্শ” কথাটা ভাবলেই কেমন একটু মিশ্র অনুভূতির সৃষ্টি হয়। একটু ভয়, আনন্দ, বিশ্বাস ভাললাগা সব মিলে একটি অনুভূতি। কিন্তু কেন এমন হয় কখনও কি ভেবে দেখেছেন? ইদানিং পত্রিকায় এটা নিয়ে বেশ লেখালেখি হচ্ছে। তাহলে নিচয়ই এই শব্দটির একটু গুরুত্ব আছে।

তাহলে চলুন স্পৰ্শ শব্দটি কি এটাই প্রথমে অনুধাবন করি। মানুষের শরীরে শিহরণ এক প্রকার বিদ্যুৎ পরিবহন। তা এই স্পৰ্শের মাধ্যমেই হয়। মন ছাঁয়ে যায়, আবেগে তাড়িত হয়ে পুলকিত হওয়া, কিংবা বিরক্ত-ঘৃণা হওয়া, তাও কিছু স্পৰ্শের মাধ্যমে মন্তিকে সংকেতের কাজ করে। ভয়ে দোড়ে এসে একে অপরকে জড়িয়ে ধরে কেপে উঠা অপর পক্ষের স্পৰ্শের মাধ্যমে থেমে যায় অর্থাৎ অভয় বা বিশ্বাস পায় স্পৰ্শের আন্তরিকতার মধ্যে। তাহলে একেতে দেখা যায়, স্পৰ্শ বিশ্বাস ভাজনে সহায়তা করে এবং ভয় দূর করে।

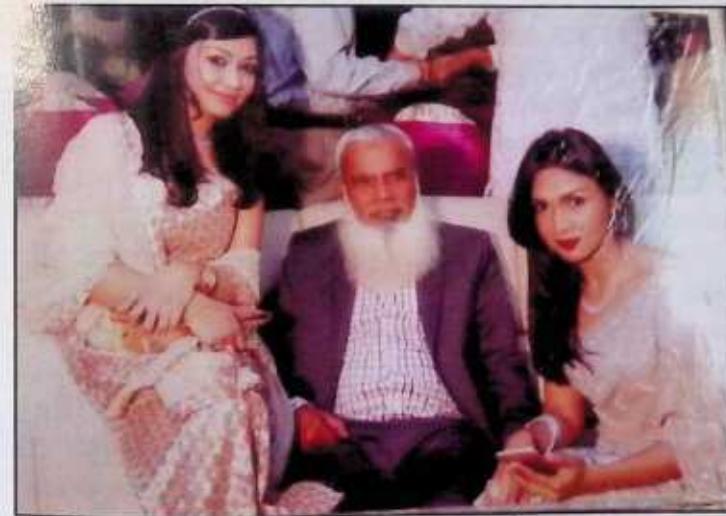
মা-শিশুর স্পৰ্শে স্বর্গীয় যে আনন্দের অনুভূতির সৃষ্টি করে কিছুটা শিল্পীর তৃলিঙ্গে দৃশ্যমান হয়। তবে পুরো ব্যাপারটা দুটি জীবনে শিশু ও আনন্দের অনুভূতি তা শুধু মা-শিশুই অনুভব করতে পারে অন্য কেউ নয়। স্পৰ্শের গুরুত্বে প্রথম ধাপ ইদানিং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার সাথে সাথে রক্ষার না করেই মার স্পৰ্শ অনুভব করান হয়। বুকের দুধের আদর্শতা ইং খুব বেশি প্রচার হচ্ছে এই স্পৰ্শের উপর গুরুত্বের ফল, বুকের দুধের গুণের যেমন বিকল্প নেই তেমন এর মাধ্যমে মা ও শিশুর ভিতর যে এ নিবিড় বন্ধনের সৃষ্টি হয় তা যেমন সুন্দর তেমন মজবুত। শিশুর বিশ্বাস, মায়া এবং শান্তির সৃষ্টি হয় এই দুধ খাওয়াবার সময়। তাই দেখা পিয়েছে সেইসব শিশু হির শান্ত, স্নেহ প্রবণ, মার প্রতি আকর্ষণ ও মেধাবী হয়। তাই সুস্থ সুন্দর শিশুর জীবনের প্রতি লক্ষ্য রেখে বর্তমানে বিদেশে শিশুর আলাদা কক্ষ বর্জন করে মার কাছে থাকার অনুমতি দিচ্ছে। শিশুকে এভাবে আলাদা রেখে দেখা যায় সমাজের অঙ্গিতা, ভয়াবহতা বেড়েই যাচ্ছে। তাই শিশুকে মা-বাবার হাজার ব্যক্তার মধ্যেও সময় দেওয়ার উপদেশ-আদেশ দেওয়া হচ্ছে।

দৃঢ়ৰ্থ-বেদনা, আনন্দ যাই ঘটুক কিন্তু স্পৰ্শ মহা-ঔষধের কাজ করে। অলৌকিকভাবে স্পৰ্শের মাধ্যমে এই অনুভূতির অংশীদার হওয়া যায়। স্পৰ্শের পরশে অদৃশ্য অভয় ও সাহস পাওয়া যায় তা অনুভবের ব্যাপার। আজকাল পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, যে সব পিতা-মাতা উভয়ে বাইরে দুটি শিশুকে যদি কিছুক্ষণ বুকে জড়িয়ে ধরা যায়, মাথায় হাত বুলান যায়, দেখা

যায় তার অঙ্গিতা-দৃষ্টিমুখী কিছুটা প্রশংসিত হয়। ছোট শিশু কাঁদলে দেখা যায় কারোর কোলে কান্না থামছে না কিন্তু মা কোলে নিলেই সে থেমে যায়। কারণ কি জানেন? শিশু প্রথমে স্পৰ্শের মাধ্যমে বিশ্বাস করতে শিখে এবং খাওয়া, প্রাক্তিক কাজে সহায়তা করে তার আরাম দেওয়া সাধারণত মা করেন। তাই তাকেই সে বিশ্বাস করে এবং কান্না থামায়। আসলে আমরা ছোট-বড় সকলেই স্পৰ্শের মাধ্যমে ভালবাসা স্নেহ বুঝাতে চেষ্টা করি, আন্তরিকতা, গভীরতা বুঝা যায় স্পৰ্শের মাধ্যমে। তাই বয়স, সময়, স্থান-কাল, পাত্র ভেদে এর ব্যবহারের মাধ্যমেই সৌন্দর্য ফুটে উঠে, নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগে সফলতা আসে।

যেমন মা-শিশু স্পৰ্শের মাত্রা সময় জ্ঞান এক প্রকার, স্বামী-স্ত্রীর গভীরতা স্পৰ্শের মাধ্যমে হয়ে উঠে স্বর্গীয় দাস্তত্য জীবন। অবসান হবে পরকীয়া প্রেম তরুণ-তরুণী যেন মাত্রা ছাড়া স্বাধীন স্পৰ্শে কোন অঘটন না ঘটায় তাও লক্ষ্য রাখতে হবে। ভাই-বেন বয়স ভেদে কতটুকু স্পৰ্শের আন্তরিক হবে সেটাও নিয়ন্ত্রিত হবে। তবেই স্পৰ্শের সুফল বয়ে আনবে বল আনন্দ।

স্পৰ্শের মাধ্যমেই আমরা ভাল-মন্দের সঙ্গে মন্তিকের ধারণ করি। দুর, অবহেলা, পরকীয়া সব স্পৰ্শের মাত্রার উপর নির্ভর করবে। হিসে এস মানে স্পৰ্শের পরশে। তাই আমাদের আগামী দিনগুলি কল্যাণ ও ধি-সুন্দর জীবনের ধারক হোক স্পৰ্শ। স্পৰ্শের গুরুত্ব সকলে অনুধাবন করণ, এই হোক আশা।



পিতার সাথে দুই কন্যা সোমা ও সুধী

ভাল মানুষ কারে কয়?

ভালমানুষ কে কাকে বলে? কেহ বলবে সেই ভালমানুষ যে মানুষকে আর্থিক সহায় করে অথবা বিপদে হাত বাড়িয়ে দেয়।

কিন্তু আমি বলব একটি মানুষের বাস্তব জীবনে অনেকগুলি পরিচয় বহন করে। অর্থাৎ একজন মানুষ খুব ভাল ভাই অথবা ভাল বাবা কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সেই মানুষটা কিন্তু স্বামী হিসাবে ভীষণ অযোগ্য।

তাহলে একই মানুষ কে মা-বাবা বলবে আমার সন্তান সবচেয়ে ভাল। বেন বলবে মাঝে মধ্যে ভাল, পাড়া-প্রতিবেশি বলবে দেখা হলে হাসিমুখে সালাম দেয়, কৃশ্ণ বার্তা জিজ্ঞেস করে। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে বলবে ক্ষণে ভাল অথবা বদমেজাজী কিংবা ভাল। সন্তান বলবে ভাল অথবা কোন রকম ইত্যাদি একই মানুষের এতক্ষণ হয় কিভাবে?

আসলে সম্পর্ক এবং ভাল মানুষ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে। ব্যক্তি মিললে যেমন খেলায় জয় করা যায় তেমনি জীবনযুক্তে ভাল মানুষ হতে পারে যে সমতা রাখে (আচার-আচরণে আর্থিক সহায়তা বেলায় ছিল)। কিন্তু সময় বাবা-মা সন্তানকে ভাল বলতে পারে এর স্ত্রী একে অন্যকে কিছুটা চিনতে পারে।

সাংসারিক বৃক্ষ, সহানৃতিশীল প্রয়োজনীয় জিনিসের পরীক্ষায় পাস করে ভাল মানুষ আখ্যা পাওয়া কঠিন।

লোক চক্ষুর আঁড়ালে দোষ যা সাধারণ মানুষের চোখে পড়ে না, তা সাধারণ কেহই বিশ্বাস করে না। যেমন একজন মানুষ পুরুষ বা মহিলা প্রত্যক্ষভাবে মা-বাবা সম্বন্ধ করে কথা বলে কেহই বিশ্বাস করবে না। যে সেই মানুষটা অগোচরে বৌ-মা-সন্তানদের সাথে নোংরামি করে বা নোংরা ভাষায় কথা বলে বা শারীরিক-মানসিক নির্যাতন করে।

তাই আমরা যদি মহামানব রাসুলুল্লাহ (স.)-কে মানবকুলের শ্রেষ্ঠ-সুন্দর-সত্যবাদী বা আল-আমীন ভবি, সহ্যশীল, সহানৃতিশীল, দয়াবান, আন্তরিক, মার্জনাকারী ইত্যাদি গুণগুলি লক্ষ্য করি এবং মেনে চলি বা অনুকরণ করি তবেই একজন ভাল মানুষ হওয়ার প্রথম ধাপ পার হতে পারি।

তিনি যেমন বৃক্ষের রাস্তায় কঁটা দেওয়ার মত গর্হিত কাজ করে ওনাকে অসুস্থ অবস্থার দেখতে ঘান সেই উদার বড় মন থাকতে হবে।

আবার এতিম বাচাদের মাথায় হাত দিয়ে কাছে টেনে আদর করা সুন্নতে। অর্থাৎ এতিমের মাথায় হাত দিলে সাওয়াব হয়। রাসুলুল্লাহ (স.) খুব বল্লহার অর্থাৎ পেটের ও ভাগ খাবার খেতেন। একের অধিক বিয়ে করেছেন রসুলুল্লাহ (স:) নারীর সম্মান রক্ষার্থে। কিন্তু সাধারণ মানুষ আজকাল বহু বিয়ে করে আর চরিত্র এবং শারীরিক জৈবিক চাহিদা পূরণে এবং দুঃখের বিষয় সন্তানরা এই প্রেক্ষাপটে কত দুঃখ-কষ্ট-অপমান সামাজিক হেনেতা হয় তা বোঝার ক্ষমতা তখন তাদের লোপ পায়।



জাতীয় অধ্যাপক সুফিয়া আপার সাথে

কিছু ব্যক্তি আছে যারা সুযোগ বুঝে রং বদলায় অর্থাৎ প্রয়োজনে স্ত্রী-সন্তানদের সমাজের চোখে ভীষণ আদর-যত্ন করে নিজস্ব কিছু দোষকে আঁড়াল করে কিছুদিন পরে আসল রূপ ধারণ করে। নিজের যা ইচ্ছা তাই করে কিন্তু একটা পর্দা দিয়ে রাখে সমাজের ভাল-মন্দ বা খারাপ-ভাল বাঁচাই করার কোন উপায় থাকে না।

কত নারী এই ধরণের নিরব নির্যাতন অর্থাৎ চিকন চিরচীর ফাঁক দিয়ে কষ্ট পায় তার হিসেব নাই। লজ্জায় বলতে পারে না কারণ আমাদের সমাজ ঐ লোকটির দোষ না দেখে যে নারী কষ্ট পাচ্ছে তাকে আরও হেয় করা থেকে অপমান করতে ছাড়ে না।

নারী-পুরুষ একে অন্যের পরিপূরক। যেমন চাঁদ-সূর্য পৃথিবীর জন্য দুটোই প্রয়োজন। মানুষকে আল্লাহ বিবেক-বৃক্ষ দিয়ে শ্রেষ্ঠ জীব করে তৈরি করেছেন। সেই মানুষ যখন সব ভূলে কিংবা বেপরোয়া হয়ে সামাজিক-পারিবারিক কর্তব্য-আচার-আচরণ ভূলে মোহগ্ন হয়ে ক্ষণিকের আনন্দ-ফূর্তিতে নিজেকে ধূলোয় লুটিয়ে দিচ্ছে তা' একবার ভাবলে আশা করি ঐ পথ থেকে নিজেকে সরিয়ে সত্যিকার অর্থে চরিত্র, আচার-আচরণে নিজেকে ভাল মানুষ জৰান্তরিত করবে। আড়ত-সমালোচনা করণ এবং ভাল মানুষ হন। ভাল মানুষ হতে অর্থের প্রয়োজন হয় না, ইচ্ছা শক্তি যথেষ্ট।

“শুভক্ষরের ফাঁকি”

মম'র আজ মন ভীষণ খারাপ। বেশ কিছুদিন ধরেই একটানা ভেবেই চলছে। ভাবনাটা নিজের জীবনের পাওয়া-না-পাওয়ার ব্যবনা খ্যাতি। বার বার মনে হচ্ছে হিসেবের কোথায় যেন একটা বড় ফাঁক আছে যা মেঘের আঁড়ালে অস্বচ্ছতার জন্য ধরা পড়েনি।

মম আর দশজন সাধারণ নারীর মত খুব স্বাভাবিক চাহিদা সম্পন্ন নারী। সুখ-বিশ্বাস-শান্তি কম-বেশি নিয়ে প্রায় ৩০ বছর পার করে দিয়েছিল। ভাল-মন্দ নিয়ে আশা-নিরাশায় ভরা সংসার কখনও হাসি-সুখ আবার কাঙ্গা-দৃঢ়খ, খারাপ-ভাল মিলে ভালই ছিল তার ছোট সৎসার।

নারীর অনেক দোষ নজর আন্দজ করে সুখ খুঁজে নিত। দশগুণ দোষ দেকে একগুণ ভালটাকে বড় করে দেখে হাসি-খুশি থাকত। যা পাই তা নিয়ে কোন আক্ষেপ নেই, যা পেত তাতেই সৌভাগ্য মনে করে হাশ থাকত। সকলে আঁড়ালে ওকে আনন্দধারা ডাকত ও যেখানে নাই আনন্দ হৈ চৈ হত।

প্রায় বিয়ের ৪৫ বছর পর চোখের দৃষ্টি ও মনের ভাবনা হিসেব পারছিল না। দিনের পর দিন যাদের জন্য দিনরাত খেটে নিজের সুখ বিসর্জন দিয়েছে বর্তমানে যে যার মত ফাঁকি দিয়ে সরে যাচ্ছে যার মত। কেউ নেই যার সাথে মনের কষ্ট ভাগ করব। অথচ এদের জন্য নিজের ছোট-বড় সুখ-স্বাচ্ছন্দ-ভোগ-বিলাসিতা ত্যাগ করেছি এখন তাদের কাছে মম'র প্রয়োজন নেই। তাকে ফাঁকি দিয়ে তার স্বামী-সন্তান কত কিছুই না করছে যা অন্যের কাছ থেকে ওনে মাঝে মধ্যে নিজের অঙ্গিত নিয়ে প্রশ্ন জাগে মনে। এই কি জীবন...

স্বামীর কত দোষ লোক চক্রের আঁড়াল করেছে এমনকি পরকীয়ার মত ঘৃণিত ঘটনা সে স্বামীকে মাফ করেছে ক্ষণিকের ভুল ভেবে। কিন্তু কুকুরের লেজ যতই তেল মাখানো যায় ছেড়ে দিলে আবার বাঁকা হবেই। চারিত্রিক দোষ শান্তিবিহীন মাফ করলে সে আবারও দুঃসাহস দেখায়। মিথ্যে বলা যার অভ্যাস এবং যার ছোটবেলা থেকে কোন শাসন থাকে না, সে কোন কিছুর ভয় কখনো করে না। সাময়ীকভাবে মনে হয় সে ভাল হয়েছে কিন্তু দেখা যায় শাক দিয়ে মাছ ঢাকার মত কখনও মাথা না লেজ বের হয়েই যায়।

মম যতভাবে একাকী ততই বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ঘটনা চোখের

সম্মুখে ভিন্ন অর্থ নিয়ে ভেসে উঠে। নিয়ন্ত্রণের প্রতি মম'র স্বামীর আঘাত বরাবর। মনোবিজ্ঞানের মতে, কিছু মানুষ আছে তারা পছন্দ করে তার চাইতে মুখ ও দরিদ্র মানুষ যারা প্রতিবাদ করতে জানে না এবং তাতে সেই ব্যক্তির ভুল ধরার সাহস-মেধা কোনটাই থাকে না এবং সেই ব্যক্তি অভ্যাস অরেণ্যেতার অপকর্ম হকুম নোংরামী চালাতে পারে না। মম'র স্বামী সেই প্রকৃতির মানুষ। এরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন আচরণের মাধ্যমে তার অভিলাশ চালাতে পারে। বাঁধা দেওয়ার কেহ থাকে না। মম'র ও তার স্বামীর মধ্যে কথা না বলার দেওয়াল কর্তৃমানে এমন শক্ত দেওয়াল হয়েছে কেউ কারোর সাথে দিনের পর দিন বাক্যালাপ হয় না। মম' নিজেকে কিছু রুটিন মাসিক কাজে নিজেকে ফ্রেমে বন্দি করে নিয়েছে সেখান থেকে আর বোধ হয় বের হওয়ার উপায় নেই। মুক্তি নেই এই মধ্য বয়সে সংসার পরিবার ত্যাগ করে নতুন করে জীবন গড়তে আর পারবে না। তাই মাঝে যথে উদাসীন হয়ে যায়। ছোটবেলায় ফিরে যাওয়া যেমন যায় না তেমনি কল আসা দিন-সময়-আনন্দ আর পাওয়াও যায় না।



হক্কি বিমান বন্দরে আমি

মানুষ বেশির ভাগ খুশি থাকে বর্তমানকে নিয়ে কিন্তু যার বর্তমান হঠাৎ করে আঁধারে খুঁয়াসা হয়ে যায়। সেই ব্যাথা-কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। অন্তর যদি শূন্য হয়ে যায় তখন এক সমুদ্র আনন্দ-খুশী সেই মানুষটাকে স্পর্শ করতে পারবে না। মম'র জীবনী শক্তি নিষ্পত্ত হয়ে যায়, জীবনবেধ বা বেঁচে থাকার কোন অর্থ খুঁজে পায় না এ সমস্যার কোন ঔষধ এই পর্যন্ত আবিষ্কার হয়নি।

মম'র মত মেয়েদের জীবন এইভাবে মাঝ পথে প্রশ্ন রেখে

নিষ্ঠেজ হয়ে পৃথিবী থেকে বিলিন হয়ে যায়। হাজার হাজার, মম এইভাবে অত্যন্ত সুখ বধিত হয়ে পৃথিবী থেকে বিলিন হয় ক'জনার খৌজ আমরা রাখি বা এর প্রতিকার করি। বিশাল এক ফাঁকির গহরে সব তলিয়ে যায়।

“সুন্দরের সংজ্ঞা”

সুন্দর কি? এক কথায় সকলে বলবে শারীরিক সৌন্দর্য যার মত আকর্ষণীয় সেই তত সুন্দর। সত্যি কি তাই? চেহারা হল মনের আয়না তবে আসল সুন্দর কিন্তু চেহারা, না কি শারীরিক গঠন, না কি মনের সৌন্দর্য? আসল সুন্দর, শারীরিক-কমনীয়-নমনীয়-কথাটার সুন্দরের সাথে যায় কেন?

মানুষ যেমন সৌন্দর্যের পূজারী তেমন আচার-আচরণেরও পূজারী। অর্থাৎ দৈহিক সৌন্দর্য যেমন আকর্ষণ করে তেমনি তার ব্যবহার কথা বলার ভঙ্গি উহ্তা কিন্তু সৌন্দর্যের মাপকাঠি। অর্থাৎ হাজার সুন্দর রং, চেহারা, আকৃতি থাকা স্বত্ত্বেও মানুষ তাকে পছন্দ না করার পেছনে তার আচার-আচরণে এবং অঙ্গভঙ্গি ভদ্রতা কমতির জন্য তাকে এড়িয়ে চলে।

সদা হাস্যময়ী লাখণ্যময়ী, দ্রেহময়ী ও সাধারণ মানুষ পছন্দ করে। এই শকগুলি সৌন্দর্যের মাফকাঠিতে পড়ে। কারণ সুন্দর যা কি না দেখলে মহিলা ভীষণ দূরের ছোঁয়া যাবে না, ধৰা যাবে না, বার বার রহস্যময় হবে, কিছুটা ভয়ের শিহরণ হবে, অনেকটা ক্লিপপেট্রা বা মোনালিসা রহস্যময় হাসির মত। সাধারণ মানুষের কাছে প্রহপযোগ নয়।

এই সৌন্দর্য এমন একটি জিনিষ সেই মানুষটির মনের পরিত্বে উজ্জ্বলতা, সরলতা তার চেহারায় কথাবার্তায় ফুটে উঠে। আর কি সৌন্দর্য তার চেহারা পাথরে খোদাই, দ্যুতিহীন, উত্থাপিত বিরাজ করে। মানুষ কাছে যেতে দিধাবোধ করে। দূর থেকে দেখে চলে যায়। আকর্ষণের বদলে বিকর্ষণ করে কারণ তার চলনে-বলনে অতিমাত্রায় অহঙ্কার বিরাজ করে। কষ্টস্বরে ধ্বনিত হয় কঠোরতা শুধুই রং ও অয়বয়ে কাঠামোগত সুন্দর ফুলস্থায়ী। বয়সের সাথে সাথে সেটাও কমে যায়। অনেকটা প্রাণহীন ফুলের পাঁপড়ির মতো। এক সময়ে করে যায় মানুষ ফেলে দেয়। কিন্তু সুগন্ধী ফুলের পাঁপড়ি মানুষ বছদিন রেখে দেয় কারণ ঐ ফুলের গন্ধ অর্থাৎ গুণাগুণ থেকেই যায়।

তাই সুন্দর বুঝতে হলে মনের আবেগ দিয়ে অনুভব করতে হবে। আস্তাহতায়ালার সৃষ্টি সবকিছুর কোন না কোন সৌন্দর্য দিয়ে তৈরি। তা বোবার মত মনের চোখ দরকার। আমরা অর্থাৎ মানুষ সব সময়ে বাহ্যিক সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে অস্থির হই, পরে অবশ্য কিছুদিন তার সাথে মেশার

পর ভাল-মন্দ আচার-আচরণে পরিচিত হই এবং সুন্দরের মর্ম বুঝি।

কায়িক বা শারীরিক সৌন্দর্য ওজন স্থায়ী কিন্তু মনের ভাবনার অনুভূতির সৌন্দর্য চিরস্থায়ী। মন ভাল থাকলে সব ভাল থাকে। আত্মায়-স্বজন, বক্স-বাক্স ও পরিচিত মহলে লক্ষ্য করে দেখলে দেখা যায়, যাকে প্রথম দৃষ্টিতে তেমন একটা আকৃষ্ট করেনি। কারণ তার বাহ্যিক রূপ তেমন চমক ছিল না। সাদামাটা কিন্তু কিছুদিন পর তার সাথে মিশে দেখা গেল সে কতটা দরদী, বৃক্ষিমতি এবং সকলকে তার আচার-আচরণে হৃদয়ে স্থান করে আপন ও প্রয়োজনীয় করে তুলেছে। তাকে ছাড়া অনেক কাজ এগোয়া না।

তাই মনে রাখতে হবে সুন্দরের মাপকাঠি শুধু দৈহিক কাঠামোগত নয়-বৃক্ষিমতা, আচার-আচরণ, ব্যক্তিত্ব মর্যাদাবোধ, সম্মানবোধ, অহঙ্কারহীন, দৃষ্টির স্বচ্ছতা, মনের পরিচ্ছন্নতা, ভাল অনুভূতি প্রবণতা, সহ্য-শক্তা, সাহায্যের প্রবণতা ইত্যাদি অনেক ছোট-বড় গুণাবলির সমন্বয়ে দৈর্ঘ্যের মাপকাঠি নির্ণয় প্রয়োজন হয়।



তুলির বাড়ির সামনে আমি ও তুলির পরিবার, হিউস্টন,

মৃত্যু-কষ্ট

কষ্ট বলতেই আমরা তাবি শারীরিক সুস্থ বা অসুস্থতার জন্য ব্যাথার অনুভূতি হল কষ্ট। সুস্থ বা অসুস্থ মানুষ বলে আমার ইঁটু ব্যাথা বা যে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ব্যাথা ইত্যাদি। কারোর মৃত্যু খবর যে কষ্ট হয় তা হলো সম্পূর্ণ মনের শরীরের ব্যাথা কিংবা মনের ব্যাথা। দুটোই কষ্টের একটা শরীরের অন্যটি মনের। শরীরের কষ্ট বা ব্যাথা দেখা যায় এবং চিকিৎসার জন্য ডাক্তার প্রয়োজন কিন্তু যে যে কষ্ট মনের হয় তা দূর করতে অনেক সময় প্রয়োজন। সত্যিকারের ভালবাসা যাকে Carry love বলে।

মৃত্যু-কষ্ট মানুষের মনে প্রচণ্ড আঘাত হানে। তার সবচেয়ে বড় কারণ সেই মানুষটাকে চিরতরে বিদায়। আর কোনদিন সচল মানুষ হিসাবে দেখা যাবে না। স্পর্শ করে অনুভব করা যাবে না। অর্ধাং জীবন্ত চলাফেরা দেখা যাবে না। আধুনিক স্বয়ংক্রিয় ডিজিটাল যুগে যান্ত্রিক সাহায্যে কি প্রকৃতি আমরা যত্রের মাধ্যমে ধারণ করে রাখি যা বহু পূর্বে এই সুবিধা ছিল না। কিন্তু স্পর্শ বা অনুভব করা যাবে না। রাগ, ঘৃণা, হাসি, আনন্দ কি করা যাবে না। এক সময় তা আমরা এই সত্যতা মেনেই নেই।

সবচেয়ে বড় কষ্ট ধৰ্ম একজন আরেক জনার উপর ভরসা, ফি নষ্ট করে চোখের সম্মুখে চলাফেরা করে, একটু একটু করে অপমানিত হওয়া, মনের কষ্ট বাড়িয়ে দিয়ে আগনে দহন করে সেই কষ্ট সহ্য করা নেই। তিলে তিলে নিঃশ্বেস হয়ে যায়। সেই মানুষ বিশ্বাস করে সে যদি ঠেক যায় হঠাৎ একদিন জানতে পারে বা বুঝতে পারে সে যাকে সবচেয়ে বিশ্বাস করেছে শ্রেষ্ঠ সম্মান দিয়েছে সেই মানুষটি ভাল মানুষের মুখোশ পড়ে উলিপোকার মত খোককা করে দিয়েছে সম্পর্কের মর্যাদা রাখেনি, তখন মনের আঘাত বা কষ্ট তার কোন শেষ নেই বা ওষুধও নেই। বিশ্বাস ভঙ্গা, অর্মর্যাদা করা, ফাঁকি দেওয়া, মিথ্যা আশ্বাস দেওয়া যে কত পাপ তা যদি মানুষ অনুভব করত তাহলে হয়ত এই অর্মর্যাদা করতে পারত না।

তাই মানুষের মন ভাঙা আর মসজিদ ভাঙার চাইতে পাপ, এটা মাথায় রাখতে হবে। সংসারের প্রথম শক্ত ভিত্তি হল একে অপরের বিশ্বাসে মর্যাদা রাখা। মানুষ মানুষকে আর্থিক সম্মতি থাকায় সেটার বিচার হয় আইন-আদালতে। কিন্তু মনের বিশ্বাস পরকালে বিচার হলেও সেই সম্পর্কের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে যায় আর সেই সুখ-আনন্দ-অনুভূতি ঘিরে পাওয়া যায় না।

মনের কষ্ট এমন প্রকট হয় যা, কিনা পৃথিবীর বড় চিকিৎসক ভাল করতে পারে না। হঠাৎ সরল-সহজ শিশু তার পরিব্রহ হাসি ও ব্যবহার ভাল করতে পারে, বিষণ্ণতা বা Depresion কোন ভাল ওষুধ নেই আছে Counceling ডাক্তার বলবে Think positive, meditation ভাল পরিবেশে থাকতে কিন্তু সেইখানে বেশি কষ্টের হয়। ঐ পরিবার ছোট সদস্য সে কিনা পার্থক্য-বিবাদ সম্পর্ক না বুঝে অনাবিল ভালবাসা দেয়, ভরসা দেয় হাসি-খুশি পরিবেশ সৃষ্টি করে তাতে অনেক সুফল হয়।

ত্রিফলনরত শিশু যেমন মায়ের কোলে গিয়ে কান্না থামায় হেসে উঠে-এটা স্পর্শের একটা বিশ্বাস। জন্মগত ৯ মাস শিশু মায়ের পেটে থেকে মায়ের স্পর্শের উপর আস্থা-বিশ্বাস জন্ম হয় তাই সে মায়ের কোন হাতের স্পর্শ অনুভব করতে পারে এবং বিশ্বাস করে। সেই শিশু পারে তার পরিব্রহ স্পর্শে সরল-সহজ হাসি, আধো আধো কথা দিয়ে একজন মানসিক কষ্টের আনুষকে সঙ্গ দিয়ে কিছুটা ভাল করতে।

তাই বলি মানুষকে কষ্ট দিয়ে কথা না বলে বুবিয়ে বললে অনেক সময় সাধ্য সাধন হয়। ডাক্তাররা অনেক সময় হাওয়া বদলে পরিবেশ বদলাতে নেন। বিশেষ করে মনের কষ্টের দূরীকরণে প্রকৃতি অনেকটা মায়ের মিকা নেয়। পাহাড়-সমুদ্র, গাছ-পালা, অরণ্য মানুষের মনের কষ্ট অনেকটা মিয়ে দেয়।



মেজে আপা ও দুলা ভাই

আমার লেখা / ৮১

“নায়াগ্রা জলপ্রপাত”

মনে পড়ে এই তো সেদিন। আমরা ভাই-বোন সব বসে একটি ঘরোয়া ভিডিও দেখছিলাম, হঠাতে ভাইয়া চিন্কার করে বললেন—এই যে সবাই দেখ, পৃথিবীর সঙ্গম আশ্চর্যের একটি আশ্চর্য নায়াগ্রা ফল্স। ওমা এ যে সেই স্থানের নায়াগ্রা ফল্স। এই নায়াগ্রা ফল্স দেখার স্থপৎ কতদিনের। প্রায়ই মনে হত, ইস্যু যদি একবার দেখতে পারতাম। ভিডিওতে দেখার পর আবার বাস্তবে দেখার প্রবল ইচ্ছা হল।



নায়াগ্রা জলপ্রপাত, আমেরিকা

১৯৯৪ সনে জুলাই মাসে হঠাতে কপাল গুণে দু'কন্যাসহ আমেরিকা যাওয়ার ভিসা পেয়ে গেলাম। মনের মধ্যে সৃষ্টি বাসনা নিয়ে সুদূর নিউইয়র্কের পথে রওয়ানা হলাম। সেখানে আমার বোন, ভাই, বোনের ছেলে-মেয়ে মিলে ১৪ জন হলাম। বিরাট দল মিলে বিভিন্ন দ্বীপে ঘূরলাম। কানি ইইল্যান্ড, এলিসি আইল্যান্ড, স্ট্যাচ অব লিবার্টি-এ সব ছাড়া আমেরিকার গর্ব ‘টুইন টাওয়ার’, এম্পায়ার স্টেটস্, ‘কুইন্স’ দেখলাম।

কিন্তু মন ভরছে না। সারাক্ষণ ভাবলা করে যাব নায়াগ্রা ফল্স দেখতে। এর মধ্যে ওয়াশিংটন ভিসির সব ঘোরা, দেখা শেষ। আমার ছোট বোন হঠাতে একদিন বলল, “এই আপু তোমার খপ্পের নায়াগ্রা যাওয়ার প্রোগ্রাম করা হল।” আমার বড় বোনের ছেলে “রচেট্টার” নামক এক শহরে থাকে সেখান থেকে খুব দূরে নয় নায়াগ্রা। সেই ভাষ্ট্রে আমাদের নিয়ে যাবে। খুশিতে অস্ত্রিল চিত্তে পরের দিন ‘গ্রেহান্ড’ বাসে রওয়ানা দিলাম। ৭/৮ ঘট্টার জার্নি। একের পর এক শহর পার হয়ে গাড়ী রচেট্টারে থামল। আমার ভাষ্ট্রে আমাদের নিতে এল। পরের দিন সকারে নাস্তা থেয়ে রওয়ানা হব। ঘট্টা তিনিকের পথ। ধারণা ছিল নায়াগ্রা যেতে পাহাড়ী পথে যেতে হবে। তাই সালওয়ার কমিজ, ফ্লাট জুতো পরে রওয়ানা দিলাম। পৌছে দেখি ওমা একি আশ্চর্য ব্যাপার। সমতল পথ “কিছুদূর হেঁটে দেখি পাশে প্রবাহমান পানির ধারা। পানি আর পানি কোথা থেকে আসছে কোথায় শেষ তা কিছু ব্যাবা যাচ্ছিল না। ক্রীজের উপর দিয়ে পানি কুলকুল ধারায় বয়ে যাচ্ছে। সে এক মৌন সৌন্দর্য।” ভাষা প্রকাশ করা যায় না। নিজের মনে প্রশ্ন করছি অশ্বখৃত সদৃশ জলপ্রপাত কোথায়? হঠাতে দেখি সকলে লাইন দিয়ে সামনের দিকে এগছে এটা Observation Deck। জন প্রতি ২ ডলার দিয়ে দূরে পৃথিবীনের মাধ্যমে সেই আনন্দময় তরঙ্গ অশ্বখৃত জলপ্রপাত দেখা যাচ্ছে। ওমা, সে যে কি আনন্দ এখনও ভাবলে শিহরিত হয়ে উঠি। উপর থেকে ভীমণ শব্দ করে জলধারা নীচে পড়ে যাচ্ছে। নায়াগ্রা নদী থেকে নায়াগ্রা ফল্স ২০০ ফুট উপরে, রাঙ্কাটি সেই ২০০ ফুট উপর থেকে চক্ষুলা কিশোরীর নৃত্যময় ভঙিতে সে নীচে নেমেই চলছে। যে নামার শেষ নেই। কানাডার দিক থেকে অশ্বখৃতের মত দেখা যায়। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তের দূরত্ব ৩৫০০ ফুট। প্রতি মিনিটে প্রায় ১৮০০ কিউবিক ফুট পানি প্রবাহিত হচ্ছে। সেই পানি নায়াগ্রা নদীর সৃষ্টি করেছে। লিফটে করে ভিতর থেকে নদীর ধারে যাওয়া যায়। নীচ থেকে এই জলরাশি এত বিশাল, মনে হয় যে ভয়ঙ্কর জলরাশি আমাদের প্রাস করে নিবে। তাই ভয়ে আর লাখেও উঠলাম না, একদম জলপ্রপাতের কাছে যাওয়ার জন্য রেইন কোট পরে পানির স্পর্শ নেওয়ার জন্য অনেকেই গেল। আমি আবার পানি দুর্বল। অর্থাৎ লখণ চেউ-এ দুলছে দেখে ভয়ে গুটিয়ে আস্তে লাইন থেকে সরে পড়লাম। আর একটা ব্যাপার, যত বড় তত দূর থেকে তার মোহময় রূপ

তত সুন্দর। কাছে থেকে পুরোটা দেখা যায় না বলে ম্লান দেখায়। স্ট্যাটু অব লিবার্টি, এম্পায়ার স্টেট-সব দূর থেকে যত সুন্দর, কাছে গেলে কেন জানি নিজেকে ক্ষুদ্র মনে হয়। তাই আবার উপরে গেলাম, একি বিশ্বয়“ কী অপূর্ণ সৌন্দর্য। মনে প্রাণে দেহে অনুভব করা যায়। কাগজে কলমে প্রকাশ করা যায় না যে ব্রীজের উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়; তার নাম ‘লেকিব ব্ৰীজ’। সেখানে গিয়ে আবার ভাবনায় পড়ুনাম, “হে সৃষ্টি কৰ্তা।” এই জলবাসির শুরু কোথায়? দিগন্ত জুড়ে পানি আৱ পানি। মনে আকাশের কোল বেয়ে স্নেহের ধারা বয়ে চলেছে। আকাশ কল্পার কান্দা আঁচল পেতে আৱ ধৰে রাখতে পাৱছে না, তাই ডুকৰে ডুকৰে উপচে পড়ছে কলকল সুরে দ্রুত গতিতে। উচ্ছুলতাৰ আবেগে প্রবাহিত হয়ে গড়িয়ে পড়ছে। বিৱামহীন অক্রান্তভাৱে অনন্তকাল চলবে এই প্রবাহিত ধারা।

কখন সঞ্চ্যা ঘনিয়ে এল। তখন মনে হল হাজার তাৰার মেলা পলিৱ মধ্যে থেকে ছিটকে ক্ষুটিক ধারা ঝিকমিক কৰে উঠল। এ যেন রাজকুলৰ বিৱহ শেষে মতিৰ মালাৰ সাজে আনন্দে ঝিলমিল কৰা। আসলে ঈ গ দিকে কানাডাৰ টাওয়াৱেৰ নাইট ও Observation deck highi র আলোৱ জন্য এই চমৎকাৰ পৰিবেশেৰ সৃষ্টি।



আহাজে নায়াওয়া জলপ্রপাত দ্রুণ

সবকিছুৰ শেষ আছে। আমাদেৱও যাওয়াৰ সময় ঘনিয়ে এল। মন ভীষণ খারাপ লাগছিল বিশ্বেৰ বিশ্বয়-আমাৰ জীবনেৰ সুঙ্গ বাসনা-তা ফেলে আসা যে কত কষ্টেৰ-তা লিখে বোঝানো যাবে না। ফিস ফিস কৰে বলল “নায়াওয়া সুন্দৰী, তৰঙময়ী, উচ্ছুল কন্যা তোমাকে ভীষণ ভালবাসি। তোমাকে ফেলে যেতে একদম মন চাইছে না। কিন্তু কি কৰব যেতে যে হবেই।” সৃষ্টি কৰ্তাৰ কাছে মনে মনে প্ৰাৰ্থনা কৰলাম যে, আছাহ আমাৰ সুঙ্গ বাসনা পূৰ্ণ হল-আবাৰ যদি কখনও আসতে পাৱি নায়াওয়া তোমাৰ সাথে অনেক না বলা কথা চুপি চুপি বলব, অনুভব কৰব, তুমি অপূৰ্ব! মোহনীয়া, তুমি অনন্যাম তুমি আমাৰ সুখেৰ স্মৃতি হয়ে থেকো। অনেকবাৰ যাওয়া হয়েছিল, পৱনতাঁতে লক্ষে চড়ে নায়াওয়া নদীৰ চেউ এবং কানাডা-নিউইয়ৰ্ক মোহনাৰ উচ্ছুলতা কোন দিন ভুলব না।



নায়াওয়া জলপ্রপাত সফৱে আমৰা কয়েকজন

সুখের সংজ্ঞা

সুখের কোন সংজ্ঞা আছে? আমরা বাহ্যিকভাবে চেহারায় মাঝে খুশী দেখি তাকে সুখী বলি। আসলে কি সে সুখী? সুখ-শান্তি পাশা-পাশি-চলাকেরা করে। কাকের সুখ আছে অর্থাৎ পোশাকে-বসবাস, গাড়ী চলা ফেরায় আনন্দ দেখলে আমরা বলি বাহু মানুষটা কত সুখে আছে। আসলে কি তাই? তার শান্তি আছে কিনা জানিনা! শান্তি একান্ত মনের ব্যাপার, তা বোঝা খুব কঠিন।

বাহিরের সুখ কিন্তু অন্তরে বেদনা থাকে তাকে সুখী বলা চলে না। হীরার গহনা পরে মার্সিটিস-বি.এম.ডেলিউ চলে রাতে শান্তিতে ঘুমাতে পারে। ঘুম ভেঙ্গে হাসি মুখে জীবন যাত্রা শুরু করে।

আসলে সুখী হতে হলে সবচেয়ে প্রথম প্রয়োজন পারিবাহিক শান্তির পরিবেশ। অন্ততে খুশী থাকা অধিক অর্থ সুখ দেয় না। স্বামী কাজের পিছনে ঘুরতে ঘুরতে অনর্থ ধারা। সন্তান-বৌ'র খোঝ-খবর করার ক্ষেত্রে থাকে না। পরাক্রিয়ায় জড়িয়ে পরে কারণ সন্তান-ঞ্জী না কাছে কে ত পেতে পরবর্তীতে সেটা একটা বোঝার মত মনে হয়। স্বাধীনভাবে চলতে মানুষ সামাজিক ধর্মীয় অনুশাসন পরিত্যাগ করে। তব্য লজ্জা নে যায়। তখন মনে হয় হাতে টাকা থাকলে পৃথিবী তার দাস, যা ইচ্ছা করতে পারে। মুরুক্কীদের কে সমান করা, ছেটদের সেই করা মানুষ অন্তর পরিকার থাকে। এই কারণে মানুষ অমানুষ পদ্ধতে রূপান্তরিত হয়। হত্যা, ধর্ষণ, চূর্ণী, ডাকাতী, ভজমী সবকিছু নির্ধিতা করে ফেলে কথার আছে না দু'কানকাটা চলে রাস্তার মাঝখান থেকে। লজ্জা-ভয় আসে সামাজিক ধর্মীয়, আজীব্যতার বন্ধন থেকে। সারা পৃথিবী সভ্যতার ভঙ্গ বাজিয়ে কি করে চলছে, বোমা বাজী, খুন, নিরিহ মানুষকে হত্যা এর অবশ্যই বৃদ্ধি হবে জানিনা। আজ পর্যন্ত কোন মানুষ শক্তভাগ সুখী হতে পারে না, কারণ সুখ একক্ষণ স্থায়ী একে ধরে রাখতে হলে সচেতন ধীর হিঁর ও ত্যাগ স্থীকার করতে হয়। একা ভাল থেকে, ভাল থেয়ে-পরে কোন মানুষ সুখী হতে পারে না। সেই ভাল থাকা যখন অন্য আরও দশজনার সাথে ভাগ করা যায় তখন সে আনন্দ অনুভূত হয় সেটাই এক ধরণের আভিক সুখ।

সুখ-আনন্দ-শান্তি যত ভাগ করা যায়, ছড়িয়ে দেওয়া যায় ততই এর গভীরতা এবং স্থায়ীত্ব বাঢ়ে। একটা আপেল-মিষ্টি-মজার খাবার যখন একা খাওয়া যায় পেট ভরে কিন্তু অন্যকে দিয়ে খাওয়ার পর যে আনন্দ-তৃণি তা আর কিছুতে হবে না। সুখের-আনন্দের কোন খবর যত একে অন্যকে জানায় বা শেয়ার করে ততগুণ কিন্তু বেড়ে যায়। আমরা একটা ভাল খবর যত তাড়াতাড়ি পারি একে অন্যকে জানাই, চেনা অচেনা কোন সর্বত্রই ছড়িয়ে দিতে চাই। যেমন-সন্তান জন্ম হওয়া, বিয়ে হওয়া, পরীক্ষায় ভাল ফল হওয়া, চাকুরী-ব্যবসায় উন্নতি হওয়া, বাড়ী ঘর হওয়া সবকিছু ভাগাভাগি না করলে সেই সুখ ক্ষণিক পড়ে বা তার সুখ না হোক দুঃখের দিন কিছু করতে পারার মধ্যে যে আত্মত্ব-সুখ তা দেখান যায় না অনুভূত হয়।

আর্থিক সুখ অনেক কিছু করে পাওয়া যায় কিন্তু সাময়িক কিন্তু কাজ করার উপকার বা বিপদে সাহায্য করার সুখ বসন্তের মত লাগে। তাই বলছি শান্তি পুরোটা মানব অনুভূতির ব্যাপার কিন্তু সুখ শান্তিকে ধরে রাখা যায়। সবকিছু একা ভোগ না করে সমাজের প্রতিদের জন্য কিছু করা সুখের ধারা অব্যাহত প্রবাহিত থাকে।



আমরা তিনি বাক্ষী

পরিবর্তনের ক্রমধারা

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের সামাজিকতা, আচার-আচরণ খাদ্যাভাস পোশাক-আশাকে পরিবর্তন হয়। অদ্বিতীয় থেকে আলোতে আসার সময় আলোর চলার পথ পরিবর্তন হয়।

সব পরিবর্তন মানুষের ভালোর জন্য হয় তা নয়। কিছু পরিবর্তন কাটে, সমালোচিত হয়। কারণ সেগুলি যুগের সাথে সময়ের সাথে উপকার বয়ে আনে না।

যেমন বর্তমান সময়ে যুব-কিশোর সমাজের আচার-ব্যবহার নিয়ে কথা হল। সমাজের অবক্ষয় নিয়ে কথা হল। বিষয় হল সমাজের জন্য কতটা সূক্ষ্ম বয়ে আছে।

বড়দের সাথে কথা বলার তাকান ব্যবহার কর্তৃ নয়। তা হওয়া উচিত। দেখা যায় ঢোখ বাঞ্ছিয়ে শক্ত হয়ে উত্তর দিচ্ছে। যা ভুলেও ভাবতে পারিনা, অনেকক্ষেত্রে ধাক্কা নিয়ে সরিয়ে দেওয়া বা উত্তরে কঠিন ভঙ্গ দৃষ্টিতে অবহেলিত ভাবে তাকান। এইগুলো প্রাতঃ ঘটছে বর্তমানে।

আমরা যেমন মা-বাবা, ভাই-বোনের অসুস্থতার সময় কলে হাত দিয়ে, মাথায় পানি দিয়ে, শরীরে আরাম দিয়ে শান্তি দে বা চেষ্টা করতাম। অথচ এখন দেখা যায় কারোর সময় নেই মাকে সে বা একটু সময় দেওয়ার জন্য। কিন্তু তাদের বেলার ঘোল আনা হওয়া চাহ। যতক্ষণ চলার গতি আছে ততক্ষণ বেঁচে থাকার সময় আছে নইলে খবর নেওয়ার কেউ নেই। ওকানো এ এক কঠিন জীবন। এখনকার সন্তানরা বদ্ধুর জন্য যতটা আঁচাহী মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মিয়সভজন এর জন্য সময় নেই।

এর প্রধান কারণ 'মোবাইল'। এই একটি ছোট যন্ত্রের মাধ্যমে পুরো পৃথিবী হাতের মুঠোয়। সুতরাং কষ্ট করে সময় বের করে কেন মানুষের কাছে বসবে কথা বলবে স্পর্শ করবে কেন?

এই প্রজন্ম বোবে না সামনাসামনি কথা বা কৃশলাদি জিজ্ঞাসা করার মধ্যে আন্তরিকতা ও গভীরতা কতটা? SMS ভিত্তিক কল Hi-Bye বরা পাতার মত কোন সম্পর্ক গভীরতার প্রকাশ পায় না। যার ফলে ওদের যখন যা মনে হয় এসএমএস করে আবার দরকার নেই ডিলেট করে ফেলে।

অথচ আমরা ইচ্ছে করলেই সম্পর্ক নষ্ট করার কথা ভাবতে পারতাম না।

আমরা ক্রমশঃ বড় হতে চলার পথে আত্মিয়সভজনের দোয়ার হাত মাথায় নিয়েছি, হৃদয়ে ধারণ করেছি তা ওরা ওনলে হাসে। কত ধরণের মানুষ একটি পরিবারকে ঘিরে আশ্রয় নেয়। সুখ-দুঃখ বন্টন করে এতে প্রশান্তিতে মনটা ভরে উঠে।

আজ লিখতে বসার একটু আগে এক সময়ের ব্যক্তিমন্ত্র নামকরা নায়িকা রত্না (শাবানা) ফোন করল। কিছুদিন পূর্বে অনন্যা মার্কেটে (ডিওএইচএস) দেখা হওয়ার পর ফোন নম্বর দেওয়া নেওয়া হয়েছিল। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম হঠাৎ দেখি রত্না ফোন করল। এ কথা সে কথার পর ফরিদাবাদ ভাই-বোন সবার কথা আলোচনা হয়। এই যে হৃদ্বত্ত এই প্রজন্মের সন্তান সেটা ভাবতেই পারবে না। কারণ আমাদের আন্তরিকতার গভীরতা ছিল যা সময়ের গহ্বরে হারিয়ে যায় নাই। ওদের সম্পর্কের গভীরতার সৃষ্টি হয়নি তা আজ বিয়ে কাল ছাড়াছাড়ি এর কারণ বিয়ের মূল্যায়নের অভাব এবং কর নিবিড়তা গভীরতার অভাব। "স্পর্শ হল মহা ঔষধ" এ কথাটা জন্য ধারণ করে না।

বিবর্তন সব সময়ে খারাপ দিক বয়ে আনে তা নয় সময়ের ধারা যা ভাল-মনুষ বর্তমানে এত বেশি স্বার্থপূর্ণ হয়ে যায় ভাল-মন্দের জন্য থাকেনা নিজের স্বার্থে সবকিছুরই কিছু নিয়ম-কানুন আছে। ইচ্ছে লাই আমরা পরিত্যাগ করতে পারি না। সামাজিক অনুশাসন বলে সে আছে তা আমরা এড়িয়ে যেতে পারি না।

মানুষের জীবন ধারা সামাজিক দিক ছাড়া আর্থ-সামাজিক পটভূমি অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আগে গ্রামের অধিপক্ষিত বা অশিক্ষিত অঞ্চলেই খুশি হত। সে তার চাহিদার মাপকাটি বুঝত না, কিন্তু এখন সে মানুষ হিসাবে তার ধ্রাপ্য জানে এবং পেতেও চায়। সেইক্ষেত্রে তাদের সাথে পরিবর্তনের মর্যাদা রেখে চলতে হয়। মালিক হওয়া মানে অমর্যাদা করা নয়। কারণ ওদের মর্যাদা না দিলে এখন নিজের সম্মান থাকে না। যুগ এখন সম্বোতার তা সংসার হোক, আর অফিস বা কর্মক্ষেত্র হোক বা সংগঠন হোক, আত্মপ্রত্যয়ের সময় শেষ। জমিদার বাড়ির সামনে থেকে জুতা হাতে নিয়ে যেতে হত এও যেমন ছিল চরম অমানবিক। আবার বড় ছোট সম্মান কখনও এক হতে পারে না এও সত্য। সম্মান অর্জন করতে হবে অসংখ্য মানুষের সাথে ভাল আচরণ তার সুখ-দুঃখ অংশীদার হওয়া ইত্যাদি। প্রথম দেখা সাথে যদি জিজ্ঞেস করা যায় ভাল আছেন মানুষ

সাথে সাথে খুশি হয়ে যায়। এরপর কঠিন সমস্যার আলোচনার মাধ্যমে
সমাধান করা যায় এ আমার পরীক্ষিত বিশ্বাস।



আপা ও দুলা ভাই

আর নয় চুপ করে থাকা। সন্তানদের সাথে বাসার কাজের সব
ধরণের সমস্যা ভাগ করে নেওয়া এমন কঠিন কিছু নয়। প্রথমে
হবে এরা আমাদের জীবনের একটি অংশ। প্রত্যেক মানুষের বি-
কাজ আছে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ার সূর্য হতে পারে কিন্তু শু-
নাই। এটা অবীকার করা যায় না, মানুষ যখন এ কাজ পরিবারের পরিবর্তনের
ধারায় স্বার্থপর হয়ে যায়, তখন প্রতিটি মানুষ মনের দিকে একা হয়ে যায়।
নিঃসঙ্গতায় মানসিক কট্টে ভুগতে থাকে, ভাগ করে খাওয়া-পরার মধ্যে যে
আনন্দ তা এই প্রজন্মের সন্তান অনুভব করতে পারে না এবং তার জন্য
আমরাই দায়ী। যৌথ পরিবার ঝামেলা মনে করে সবাই নিজেদের একক
পরিবারে নিয়ে দেখা গেল সন্তানদের পরিবারের অন্যত্র সদস্য দ্বারা যে স্ব-
শিক্ষিত হওয়া যেত তা হারিয়ে অগ্রিম রোবট হয়ে যাচ্ছে। বিদেশে সন্তানে
২ দিন ছুটির দিন ১ দিন অস্তত পরিবারের সেটাও করি না। ছুটির দিন
আমাদের সময় কত আনন্দ হত। ভাল আবার দল বেঁধে খেলা, বেড়ান
এখন কি হচ্ছে? একা ভাল না লাগায় কম্পিউটার গেম না খেলে চ্যাট করে
বিপদগামী না হয়ে চলুন আমরা সন্তানদের সময় দেই। এই মহাবিপর্যয় এর
হাত থেকে ওদের বাঁচাই এবং নিজেরাও স্বত্ত্ব পাই।

আমার লেখা / ৯০

ঢাকা উইমেন কলেজ প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষা তৌফিকা মাহমুদ এর জীবনী

জন্ম : ১৯৪৫ সালের ১লা ফেব্রুয়ারি
জন্মস্থান : কলকাতা
দাদা বাড়ি : মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় থানার দশটিড়া ঘাম
পিতা : সৈয়দ আবুল মাহমুদ (তৎকালীন টি.এন.টি'র সুপারিনিউটেন্ডেন্ট
ইঞ্জিনিয়ার, কর্মক্ষেত্র কলকাতা)
মাতা : সৈয়দা আজিজা বেগম (ভারতীয় উপমহাদেশীয় কংগ্রেসের সদস্য)

চার ভাইঃ
১। সৈয়দ আবু সাইদ (ইঞ্জিনিয়ার)
২। সৈয়দ আবু জাহিদ (আকিটেট ইঞ্জিনিয়ার)
৩। সৈয়দ আবুল কালাম (এম.এস.সি পদার্থ বিজ্ঞান)
৪। শামীম মাহমুদ (ইঞ্জিনিয়ার)

বানী:
১। ডাঃ মহসিনা বেগম (১৯৫২ সালের ভাষা সৈনিক)
২। তৌফিকা মাহমুদ (বৈবাহিক)
৩। শামী : মরহুম এম.এ. নূরুল করিম (ব্যাংকের উর্দ্ধতন কর্মকর্তা)
শৃঙ্খল : এনারেত করিম (বিশিষ্ট সমাজ সেবক ও দানবীর)
একমাত্র ছেলে: আবু নাসের তৌফিক করিম (এম.বি.এ অধ্যায়নরত)
একমাত্র মেয়ে: সাবিনা ইসলাম (এম.বি.এ.-ইউ.এস.এ, লেকচারার,
ক্যালিফের্নিয়া)
৩। এডভোকেট জাকিয়া আহমেদ (বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের
আইনজীবী)

শিক্ষা জীবন:
মেট্রিক কুলেশন (সৈয়দপুর গার্লস স্কুল, সৈয়দপুর)
এইচ.এস.এস (রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী)
বি.এ অনার্স (ইসলামের ইতিহাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
এম.এ (ইসলামের ইতিহাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)
এম.এ (সাধারণ ইতিহাস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)

কর্মজীবন:
শিক্ষা জীবন শেষ করেই তিনি উপলক্ষ্য করতে পারেন নারী শিক্ষার বিকাশ ছাড়া

আমার লেখা / ৯১

বাংলি জাতির উন্নতি সম্বন্ধে নয়। তাই তিনি শিক্ষকতাকে বেছে নিয়ে ১৯৭৭ সালে লালমাটিয়া মহিলা মহিলবিদ্যালয়ে ইসলামের ইতিহাস বিষয়ে প্রভাবক পদে যোগদান করেন। এরপর একের পর এক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করতে থাকেন। তিনি ঢাকার মিরপুরস্থ ইসলামী মহিলা মহিলবিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এবং পঁঢ়পোষক, নর্থ পয়েন্ট ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান, টিকে ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। দীর্ঘ বিশ বছর লালমাটিয়া মহিলা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে সহযোগী অধ্যাপক এবং ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃত বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৮ সালে জাপানে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শিশু দিবসের সেমিনারে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন। ১৯৮০ মালে নয়াদিল্লির জুচি কল্যাণের যোগদান করেন। ১৯৮৪ সালে চীনের শিক্ষা মন্ত্রীর সফর করেন। ১৯৮৮ সালে অস্ট্রেলিয়া থেকে টিচার্স ট্রেনিং বিষয়ে ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন। ১৯৮৯ সালে লঙ্ঘনে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনারে যোগ দেন। ১৯৯১ সালে উত্তরায় ঢাকা উইমেন কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তিনি প্রতিষ্ঠা অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন। ১৯৯৪ সালে নারী বিষয়ক সেমিনারে যোগ দেন ব্যাংককে। অসংখ্য সমাজ সেবকমূলক কর্মকাণ্ডে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশ নে অসংখ্য সামাজিক সংগঠনের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। তিনি শিক্ষার বিকাশীয় অবদান রাখার জন্যে ১৯৯৬ সালে শেরে বাংলা বৰ্ষ পদক লাভ করে তিনি বাংলাদেশ নারী আন্দোলনের চেয়ারম্যান, চীন বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি



ঢাকা উইসেল্স কলেজের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক প্রয়াত তোশিকা করিম ও অমি

আমাৰ লেখা / ৯২



ঢাকা উইমেন কলেজের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীভে শিখনকদের সাথে আয়োজিত

বিষয়ক স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ শিশু কিশোর ফেডারেশনের
পদচার্তা, উইমেন কমিটি, উত্তরা সমৰ্পয় পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি ন্যাশনাল
ডারেশনের অফ চিচার্স এসোসিয়েশনের আন্তর্জাতিক সম্পাদক, বাংলাদেশ
গজ চিচার্স এসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক, এডুকেশন ইন্টারন্যাশনাল
যৱিকার সদস্য ছিলেন। তিনি অবহেলিত শিশুদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত
র লক্ষ্যে ২০০০ সালে উত্তরাঞ্চ ১০ নং সেক্টরে প্রতিষ্ঠা করেন উত্তরা
প্রিলারেটরী ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। যাহা বর্তমানে তোফিক মাহমুদ প্রিপারেটরী
ইন্টারন্যাশনাল স্কুল নামে পরিচিত।

মৃত্যু: ২০০১ সালের ২১ মার্চ পবিত্র হজুরত পালন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ২২ মার্চ শেষ নিঃখাস ত্যাগ করেন।

সভ্যতার ইতিহাস মহামানব-মানবীদের সাধনা, ত্যাগ, তিতিক্ষা এবং পরিশ্রমের মহিমায় ভাস্বর। তাদের মধ্যে অন্যতম একজন তৌফিকা মাহমুদ। এ দাবী আমাদের এ দাবী সময়ের।

পরিশেষে তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি।

সামাজিক পরিস্থিতি এবং বর্তমানের আমরা

বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি এত ভয়ঙ্কর হচ্ছে যে প্রতিদিন টিভি খবরের কাগজ পুলালে আমরা কী দেখতে পাই? দিনকয়েক আগে, তা আবার নিজ গৃহে নিজ শয়নকক্ষে। এর দায় কে নেবে? ঘরে-বাইরে নেই কোনো নিরাপত্তা। কারণ মানুষ আর মানুষের মধ্যে নেই।

সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ অথচ আচার-আচরণে আমরা হায়না হয়ে যাচ্ছি। মানুষ যখন জন্মে মতো আচরণ করে তখন সেই দুঃখ কোথায় রাখি? ডিজিটাল উন্নয়নে আমরা নিজেদের সত্ত্ব জাতি বলে দাবি করি। আসলে সমাজে ঘটে যাওয়া ঘটনা থেকে কী দেখতে পাই? শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গরিব-ধনী কেউই এর থেকে রেহাই পাই না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র এবং গৃহে। কখনো শিক্ষক নামধারী পুরুষের লোভী শয়তান মুখোশ পরা। কখনো প্রেমিক, কখনো অফিসের বর্তা, কখনো স্বামী ‘দেবতা’ নামক দানব-বর্বর আচরণ। বিচারের লক্ষণ শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চলছে, তার কোনো বিচার নেই। তো সেদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের কর্ম জঘন্য নির্ময় তাঁ চরণ এক সময়ের প্রেমিক বর্তমান স্বামীর দ্বারাই হলো। সেই ভয় কাহিনী জানে না-এমন মানুষ বাংলাদেশের তথা কানাড়া পর্যন্ত আলয়।

আর একটি ঘটনা, স্বামী স্ত্রীকে সারপ্রাইজ দেওয়ার নামে তত-পা বেঁধে হাতের কঙ্গি কেটে দিল। বিচারের নামে অর্ধ উলঙ্গ করে বেতের বাড়ির শাস্তি, মিডিয়া মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রচার করা হয়েছে সেই নির্যাতনের কর্ম কাহিনী। আমরা মনে পড়ে, অনেকদিন আগে ঘানি টানার জন্য রংপুরের একটি গ্রামে গরুর বদলে মেয়ে-মানুষকে কাজে লাগানো হতো। জিজেস করা হলে ওই গৃহস্থ উত্তর দিয়েছিল-‘মাইয়া মানুষের দাম গরুর চাইতে কম, তাই ঘানি টানে বৌ রাই। গরু কেনার চাইতে বিয়ে সহজ।’

আমরা উত্তরা লেডিজ ক্লাবের সৌজন্য অ্যাডভোকেট সালমা আলীর সহায়তার পারিবারিক আইনি সাহায্যতা দেওয়া হয়। বহু নির্যাতিত নারী-কন্যা এর মধ্যে আইনি সাহায্য পান।

এক মা তাঁর মেয়েকে নিয়ে বিচারের আসায় এসেছিলেন। জানতে

পারলাম, মেয়েটাকে তিন দিন গৃহে আটক রেখে স্বামী-শাশ্বত্তি নির্যাতন করেছে। মেয়েটি একটি সন্তানের মা এবং অনার্সে পড়ছে। সেদিন ছিল আমাদের আদালত দিবস। ক্রমশ ভিড় বাঢ়ল। তাকিয়ে দেখি সব ১৮-২২ বছরের মধ্যে। উঠতি বয়সের মেয়ে। ফুল না ফুটতেই যেন সব পাপড়ি পোকার দখলে বারে যাচ্ছে।

সুন্দর আমেরিকা থেকে আমাদের পারিবারিক আইনি সহায়তায় তাঁর নিজ সন্তানের দাবিদার হয়ে সন্তান পেয়ে ফিরে গেছেন আমেরিকায়। দুষ্ট স্বামীর অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আরো কত ঘটনা! যে দেশের প্রধানমন্ত্রী, বিশ্বামী দলীয় নেতৃত্ব, স্বরাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, কৃষিমন্ত্রী মহিলা-সেই দেশে সর্বস্তরে যখন নির্বিকার অত্যাচার বেড়েই চলছে, তখন ৮ মার্চ নারী দিবস পালনে মনে হয় নিজের সঙ্গে ঠাট্টা করা হচ্ছে।

নারীরা পিছিয়ে নয়। দিন দিন বাড়ছে তাঁদের পদমর্যাদা। ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, শিক্ষক, সামরিক বাহিনী, পুলিশ বাহিনী কোথায় নেই নারীর রণ। কিন্তু অত্যাচারের মাত্রায়ও এসেছে ভিন্নতা। এসব প্রতিরোধ উঁচু থেকে সর্বস্তরে সুস্থ পরিকল্পনা করতে হবে। এগিয়ে আসতে হবে র জনতাকে। শুধু সরকার আর মানববিধিকারের দাবি কোনো সমাধান সেই মানুষ অত্যাচার করে তা বাসায় হোক, অফিসে হোক-ঘৃণ হবে। হতে হবে সোচ্ছার। সমাজের অবক্ষয় রোধে মিডিয়ায় এখন ক প্রোগ্রাম হচ্ছে।

সন্তানদের মধ্যে আচরণ ও সহনীয়তা বাঢ়াতে হবে। শাশ্বত্তির হাসিমুখে বেচ্ছায় মাছের মুড়েটা বৌ-এর পাতে দিয়ে শাস্তি পেতে হবে। সন্তানের মধ্যে পার্থক্য দূর করতে হবে। পুরুষকে সৎসারে সেতুর ভূমিকা পালন করতে হবে। বৌ-শাশ্বত্তির দৃঢ়ত্ব কমিয়ে মমতার বাঁধনে জড়াতে হবে। ‘মানুষ হিসাবে সকলেই সকলকে সম্মান ও ভালোবাসার বন্ধনে আবক্ষ করি করতে হবে। আমরা জন্ম নই, মানুষ-সেটা আচরণে প্রমাণ করতে হবে। মাইয়া মানুষ না ভেবে কখনো মা; বৌ, জায়া, ভগ্নি ভেবে সম্মান করি, পুরুষ-স্ত্রী একে অন্যের পরিপূরক। কেউই আমরা একা সম্পূর্ণ নই। তাই আসুন এই কুন্দু জীবনকে সুন্দর কাজের মাঝে সম্পূর্ণ মানুষ করে তৈরি করি।’

কোথায় পাবো তারে

জন্য হোক যথা কর্ম হোক ভালো-

সত্তি এই কথাটি প্রমাণ করে গেলেন আমাদের সকলের শুভাভাজন প্রিয় তোফিকা আপা। দশ বছর পূর্বে আপার সাথে আমার প্রথম পরিচয়। ওনার কথা বলার যে মোহ আকর্ষণ ছিল তা প্রথম দিনেই ওনাকে ভীষণ কাছের মানুষ বলে মনে হয়েছিল। আজ উনি আমাদেরকে ছেড়ে পরপরে এত আকস্মিকভাবে চলে গেলেন যা আমাদের সকল শিক্ষক-ছাত্রী-কর্মচারীবৃন্দের কাছে অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। তিনি নেই শারীরিকভাবে কিন্তু কলেজ প্রাঙ্গণের প্রতিটি কাজে প্রতিটি জিনিসে ওনার স্পর্শ এখনও জীবন্ত। কানে বাজে ওনার কষ্টস্বর কখনও আনন্দময়ী কখনও আনন্দময়ী সব মিলে ওনার তুলনা শুধুই উনি।



মেলবন, অস্ট্রেলিয়া

“পথ পথিকের সৃষ্টি করে না পথিক পথের সৃষ্টি করে”। মানুষ অদ্বৃত্ত দ্বারা সৌভাগ্য রচনা করতে পারে না। বরং সে নিজের শক্তি সাধনা ও কর্মদক্ষতায় সৌভাগ্যের সৌধ নির্মাণ করে। আপার জন্য কথাটি প্রতিটি

অঙ্করে অঙ্করে সত্য ছিল। সুদূর মোহাম্মদপুর থেকে বেবিট্যাক্সি, বাসে, রিক্রা করে এসে তিনি কতবড় ঝুকি নিয়ে এই সুদূর উত্তরায় মহিলাদের জন্য ঢাকা উইমেন কলেজ নির্মাণ করলেন। তিনি তখন লালমাটিয়া মহিলা কলেজের অত্যন্ত জনপ্রিয় শিক্ষিকা ছিলেন। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। কত বাঁধা বিপত্তি কত প্রতিকূল পরিবেশে নিজের প্রতি অবহেলা করে এই কলেজের উত্তরণ করেছেন তা একমাত্র তখনকার সময় যারা আমরা কিছু পুরান শিক্ষক এখনও আছি তারা স্বচকে দেখেছি। তার সবচেয়ে বড় গুণ ছিল কোন কাজ করার প্রয়োজন হলে তাতে যত বাঁধা বিপত্তি আসুক না শব্দটি ব্যবহার হত না। আজ আমরা যারা অনেক কাজ করতে পারছি তা শুধু তারই সাহচর্যে থাকার সু-ফল।

তাঁর কথায় ছিল, ভোগ প্রবৃত্তির বক্ষন মোচনে মুক্তি লাভ সম্ভবপর এবং মুক্তিতেই সুখের স্বাধ পাওয়া যায়। কারণ তিনি সব সময় বলতেন ভোগে সুখ নেই আছে ত্যাগে, যার ফলে ছেলে, মেয়ে, বৈন সুন্দর বিদেশ থেকে কিছু অর্থ, মূল্যবান দ্রব্য পাঠাত তা দিয়ে তিনি কলেজের উন্নয়নে, ছোট এতিম শিশুর কল্যাণে নারী নির্যাতনের অবস্থা পরিবর্তনে খরচ তন। আপার চেহারা দেখলেই বুঝতে পারতাম হয় কোন কাজ ত্বকভাবে করতে গিয়ে সফল না হয়ে রাগ বা সফল হয়ে আনন্দিত। জন করলেই দেখতাম ঠিক তাই, হয় কোন খারাপ খবর নয় সু-খবর। এ শুধু একজন প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষাই ছিলেন না। তাকে আমরা সকলেই ত্বক করতাম কখনও দ্বেষহীন মাঝের রূপে, কখন বুদ্ধ রূপে, কখনও ত্বকাবক রূপে তিনি আমাদেরকে সুউপদেশ দিতেন। তিনি চলে যাবেন এত তাড়াতাড়ি তা হয়ত আমরা বুঝিনি কিন্তু এখন কিছু কথার অর্থ চিন্তা করলে বুঝা যায়। তিনি ভাবতেন কলেজের কোন কাজ কে করবে, প্রায়ই তা নিয়ে আলোচনা করতেন আর বলতেন আমি আর কয়দিন। আপনারা দেখবেন, কখন নিজ জমিতে যাবে, কখন নিজস্ব কলেজ ভবন হবে এই ছিল তার ধ্যান-জ্ঞান। ঢাকা উইমেন নাম দিয়েছিলেন বৃহত্তর চিন্তা ধারায় যা কি না এক সময় বিশ্ববিদ্যালয় রূপ নিবে এই ছিল তার অন্তরের বাসন। তিনি ছিলেন এ যুগের বেগম রোকেয়া। তার প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ইসলামিয়া মহিলা কলেজ, নর্থ পয়েন্ট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রি-পারেটরি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। বয়স তার এমন হয়লি চলে যাবার মত। কর্মে তাকে নিঃশ্বেষ করেছে। নিজের প্রতি তার ছিল না কোন আরাম আয়েশের খেয়াল,

সবচেয়ে মত খাওয়া, বিশ্রাম কিছু তিনি করতেন না। শুধু কাকে যোগাযোগ করে কোন কাজটি এগিয়ে নেয়া যাবে। এই ছিল চিন্তা আমাদের এই কলেজে সব ধরনের খেলাধুলা বিতর্ক শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রতিযোগিতা, কম্পিউটার, পিকনিক, শিক্ষা সফরের সবই করা হত। আপার কথা ছিল যা আছে তাই ঘসেমেজে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে ধরতে হবে। পিছিয়ে গেলে হবে না। টিচার্স ট্রেনিং কলেজ সংস্থায় কম থাকায় একদিন তিনি আমাদের কয়েকজনকে নিয়ে তাও খুললেন, সেই কলেজ অবশ্য এখন NTU নামে ফিলথেকে চলে গেছে। কিন্তু এর প্রতিটাতা আপা এবং আমরা কয়েকজন ছিলাম। বড় বড় অনুষ্ঠান আয়োজনে একদিনের ভিত্তি সব ঠিক করে আমাদের উপর কিছু দায়িত্ব দিতেন এবং বরেণ্য ব্যক্তিদের তিনি আমাদের কলেজ দেখাতে নিয়ে আসতেন। এইভাবে অনেক মন্ত্রী মহোদয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য, এম.পি অনেক মহান ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে তিনি আমাদের কলেজের সকলকে পরিচয় করিয়ে দিতেন। লক্ষ্য করতাম সকলেই আপাকে তীব্র শুন্দা করে ও ডালবাসতেন। একজন যিনি আমাদেরও প্রিয় সার ডঃ আবু ইসমেদ আপারও স্যার। তিনিও আপাকে ভীষণ ভালবাসতেন আপার এ কাজকে শুন্দা করতেন।

গত জানুয়ারিতে আমরা পিকনিকে গোলাম কত আনন্দ পাম। মিউজিক্যালপিলেও তিনি আমাকে ডেকে বললেন আপনি হোৱা আরা প্রথম হবেন। আশ্চর্য তাই হলাম, আপার কি আনন্দ, আবার গুৰু ওলতে চাইলেন। গাইলাম সেকি আনন্দ। আর কি কেহ ডেকে বলবেন? বখনও হোসনে আরা কেমন আছেন? বাচ্চারা ভাল? বা কি ব্যাপার অনেকদিন দেখি না কেল? এই শাড়ীটা বেশ মানিয়েছে ইত্যাদি। কলেজে যারা শুরু লগ্ন থেকে সুখে-দুঃখে ঢাঢ়াই উত্তরাই পার হয়ে এর সাথে জড়িত ছিলাম তাদেরও জীবন ছিল এই কলেজ। যাই হোক আসলে কীর্তিমানের মৃত্যু নেই এটাই সত্য কথা। আপার এত বছরের শ্রমের মূল্য আমরা যদি ধরে রাখতে চাই তবে আমাদের সকলকে লোড-সুনাম ইত্যাদি উর্দ্ধে থেকে একত্রে কাজ করে যেতে হবে। মূল্যাই যদি না দিতে পারি তবে আমরা নিজেরাই ত মূল্যায়ন হয়ে যাব এ কথা মনে রাখতে হবে। এবার ডিগ্রী পরীক্ষার আমাদের ঢাকা উইমেন কলেজের ফলাফল শুরু ভাল। ৫জন প্রথম শ্রেণী এবং পাশে হার জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০% কিন্তু আমাদের ফলাফল প্রায়

৭০%। যখন ফলাফল শুনলাম তখন আমরা সকলেই অনুভব করলাম কতই আনন্দ হত যদি তিনি এ খবর শুনে যেতে পারতেন। তবুও মনে হচ্ছে হয়ত তিনি আমাদের জন্য দোয়া করছেন। আর আমাদের প্রতিষ্ঠা করতে হবে—এই ঢাকা উইমেন কলেজের উন্নয়নে আমরা সকলে যার যার সাধারণত কাজ করে যাব, তবেই আপার প্রতি সত্যিকারের শুন্দা নিবেদন করা হবে।



তাহিমা আপার পরিবারের সাথে আমি, লৃজিয়ানা

“শেষ কোথায়”

যেখানে শেষ সেখানেই শুরু। শেষ বলতে আসলে কিছুই নেই, আজ যা বেশী গুরুত্বপূর্ণ তা কালকে প্রয়োজন ও সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তন হতে পারে। ভাল-মন্দ আসলে কেটার শেষ নেই।

শুরু করছি সমাজে নারী বর্তমান অবস্থান নিয়ে, যা চলমান প্রতিষ্ঠার মধ্য থেকে অতিত বর্তমান-ভবিষ্যত দিকে প্রবাহিত হচ্ছে। আমরা নারী স্বাধীনতা-অধিকার নিয়ে ব্যানার ফেস্টিভ শ্লোগান, সেমিনার করে বাহবা পেরে দেখা যাচ্ছে বাসায় এসে উটেটা। কোন না কোন ভাবে হেনেন্টা হচ্ছে। পরিবার দ্বারা যখন কোন নারী অপমানিত বা লজিত, ঘৃণিত হয় তখন না যায় বলা না যায় সহ্য করা, Poet William Golding তার একটি কবিতায় উল্লেখ করেছেন নারী সমর্থিকার। তাই পুরুষদের মনে রাখ হবে আঘাত করলে তিনগুলি প্রতিষ্ঠাত পাওয়ার জন্য তৈরী থাকতে হবে

এই বাস্তব চিত্র ৯০% নারীর ভাগ্যে জোটে। প্রথম: পুরুষ নও চায়না তার ঘরের নারী সদস্যাটি উচু মহলে আসিন হোক। এই নারী নিজকে হেয় মনে করে, অর্থ মানুষ হিসাবে যদি তুলনা করতে হলে আনন্দিত হওয়ার কথা। শুধু পুরুষের দৃষ্টি ভঙ্গি চেতনা বদলা হবে না যতক্ষণ এক নারী অন্য নারীর ওক্তা তুলে ওভাকাঞ্জি হতে না হবে, আমার এক ভাইয়ের বৌ অতিরিক্ত সচিব এবং তার তিনি বোন যুগ্ম হব। শুনতে কত ভাল লাগে কিন্তু সত্যিকার অর্থে ক'জন নারী এই উচু মনে কর্মরত তা আবার একই পরিবারের। কিন্তু কথা হল এই সম্মানজনক অবস্থানে কর্মরত থেকেও তিনি কতটা আনন্দিত। সেটা একান্ত ভাবনা তবে স্বামী বা শুধু বাড়ীর সদস্যারা যতটা খুশী বাইরের মহলে বলে সম্মানিত হতে ততটাই আত্মপ্রত্যায় নয় তুলনা মূলকভাবে নিজেকে উপস্থিত করতে। কোথায় যেন একটু কষ্ট, একটু বিরক্ত, একটু অপমান নিজের তুলনায় উচু অবস্থানে নারীকে দেখতে পুরুষরা আসলেই অভ্যন্ত নয়।

একবার আমার সম্মুখে এক অচেনা ব্যক্তি এসে বলল: আপা আপনারা এত কিছু করেন পুরুষ হন দেখে ভাল লাগে। আর আমার বৌ কিছু পারে না, আমি বললাম ওনাকে আপনি এই অনুষ্ঠানে নিয়ে এসেছেন? তিনি বললেন না ওকে কি আনব ওতো কথাই বলতে পারে না। আমি বললাম

এর জন্য আপনি দায়ী কারণ তাকে আপনি দমিয়ে শাসিয়ে অবহেলা করে কোন সুযোগ দিচ্ছেন না। যান বাড়ী গিয়ে নিজের ভুল শুধরে বৌকে সম্মান দেন এরপর আমাদের কাছে তাকে নিয়ে আসবেন।

এইতো চিত্র, অন্যের বৌ-সন্তান এক ধরণের কাছে ভাল নিজের টা অবহেলিত। যেখানে হিলারীর মতন বৃক্ষিমতি, শিক্ষিত এক সময়ের বৈদেশীক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ভোটে হেরে গেলেন ট্রাম্পের মত মানুষের কাছে। ২০১৮ বছরে আমেরিকায় নারীর সম্মানজনক পদ উন্নত হতে পারলো না। সমগ্র বিশ্বের নারী জাতির অপমান হিলারীর হেরে যাওয়ায় নারী ইউরোপ, বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া আরও কত দেশে নারীর অবস্থান কত উচুতে। একমাত্র আমেরিকায় নারী মূল্য অপমানজনক। শোনা যায় নারী পাইলট প্রেন চালালে অনেক পুরুষ যাত্রী টিকেট ফেরত নেয় বা বদলায় কতটা যুক্তিহীন অসম্মানজনক অবস্থায়।



শাহিন ও আমি



মিঠু, নিশু ও আমি

একই মায়ের পেটে পুত্র সন্তান ও কন্যা সন্তান অর্থাৎ, কল্যা হলে আস্তে আজান আকিকা একটা খাশী, ছেলে সন্তান জোড়ে আজান ও ২টা খাশী। সম্পত্তির ভাগ অত্যন্ত দুঃখজনক ভাবে, শরিয়া আইন বলে কথা। শুধু মেয়ে বলে সন্তানের সম্পত্তির ভাগ কত ক্ষুদ্র।



পারিবারিক সফর

আমরা সচরাচর বলে থাকি আমার মেয়ের বিয়ে দিব বা গান্ধীজির আসবে। বিয়ে হয় একটা ছেলের সাথে একটি মেয়ের দুই পরিচয়। কিন্তু ছেলে পক্ষ এমন একটা ভাব দেখায় ছেলে বিয়ে মেয়ের বিয়ে হয়। আর আমরা একটা প্রক্রিয়া কিছু সীমিত আনন্দানিকতা, ভাবধানা এমন মেয়ের পরিবার যেন কি অপরাধ বলে আন্দোলন করে। ছেলের পরিবারই মুখ্য আর সব গৌণ। একটি 'ছেলেত' একটি মেয়েকেই বিয়ের বক্ষনে আবক্ষ করবে, তা' হলে এত অহংকার কিসের? এই দুঃখ শুনি সমাজের নোংরামি ও নির্যাতনের আসল কারণ। অচিরেই এই চিন্তাচলনার অবলুপ্তি দরকার।

আমরা বিবি ফাতেমা ও বিবি আয়শা, বিবি খাদিজার, সময়কার কথা বলি সম্মান দিয়ে। অথচ এ যুগের অনেক নারী হাজার ভাল কাজ করেও স্বামী, সন্তান, শুশুর বাড়ীর লোকদের কাছে অবহেলিত নির্ণিত, এর শেষ করে জানিনা।

আমি আমার এই দীর্ঘ পথ চলায় অনেক ভালমন্দ দেখেছি, ভিন্নতা মানুষের ব্যক্তিতের বৈশিষ্ট্য কিন্তু "মাইয়া মানুষ" বা "তোমাদের মত মেয়ে মানুষ" এই উকি দিয়ে যে সব পুরুষ কথা বলে তাদের জন্য দুঃখ হয়, না তারা ইহকাল স্তু-কন্যার সম্মান পেল না পরকালে। অথচ সহমীতা দেখান

কোন কঠিন কাজ না, নিজে সম্মান পেতে হলে অন্যকে সম্মান করা প্রয়োজন এ কথা মনে রাখতে হবে।

একটি পুরুষের অঙ্গীকার পেটে নয় মাস জন্মের পর মায়ের দুধ খেয়ে ক্রমশ বড় হতে মায়ের বিকল্প নেই। অথচ সেই মায়ের জাত স্ত্রী হয়ে একইভাবে নিজের ঘর পরিবেশ ছেড়ে শুশুর বা স্বামীর বাড়িতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে তিলে তিলে নিজের অঙ্গীকার পরিবর্তন করে নতুন মানুষে পরিবর্তিত হতে হয়। সেই কল্প পুরুষ কখনও বুঝে না কারণ তাদের তা করতে হয় না। তখন প্রয়োজন ভালবাসা, স্নেহ ও নির্ভরতা হাত বাড়িয়ে মেয়েটাকে আপন করে নিজে ও তাকে সুরূ করা যায়। নারী অন্য নারীর সম্মান দিয়ে এর সমাধান করতে পারে।

বর্তমান ডিজিটাল যুগে প্রায় অভিভাবকদের বলতে শোনা যায় আমার মেয়ে বা আমার ছেলে বিয়ে করতে চায় না। এটা সমাজের জন্য কতটা ব্যাপক তা কিন্তু ভাবনার বিষয়, মানুষ যত নির্ভরতা হ্রাসে শুনতো দেখতে হতে ততই আনন্দিত হয়ে গুটিয়ে যাচ্ছে অন্যের বা সমাজের কথা হচ্ছে। তাবে এই সমাজে বর্তমানে স্বাধীনভাবে চলা যায় যদি অর্থ দিন করা যায়। শুধু শুধু কেন নির্যাতনকে আহ্বান করব বিয়ে নামক কে। তাদের কাছে ধর্ম, সমাজ ভালবাস, স্নেহ, মর্যাদা কোন মূল্য নেই।

স্কুল করলে দেখবেন যত আইন ততই ফাঁকি, না হলে দিনের বেলায় যা প্রতিষ্ঠানে খাদিজাদের মতন ছাত্রীদের নির্যাতিত হতে হবে কেন? শুধু

নয় তারা বেল পেয়ে সদর্শে নাকের ডগা দিয়ে ঘুরে বেড়ায়। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে স্পিকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে এমনকি বিশ্বাসী দল সব বড় মাপের নেতৃী থাকা অবস্থায় এদের মত মানুষ রূপে পাত্র ঘুরে বেড়ায়। হায় নারীর দুর্ভাগ্য, যারা আমাদের দেশ রক্ষা করে তাদের ছত্রছায়া কুমিল্লার ক্যান্টনেট তরুণী ধর্ষিত হয় কিন্তু বিচারের প্রহসন আর হাহাকার সর্বত্র।

প্রতিটি ঘরে ঘরে পারিবারিক নেতৃত্বক শিক্ষার প্রচলন শুরু না হলে সমাজের কলঙ্ক ঘোচন হবে না। যতক্ষণ একটি পুরুষ রূপি রাষ্ট্রস মায়ের সম্মান, বোনের সন্তুষ্ম, শিশুদের স্নেহ করতে শিশুকাল থেকে শিখবে না ততক্ষণ কোন পরিবর্তন আসা করা যাবে না। অনেক মাকে শুনি জোর করাত শিক্ষায় তার মেয়ে শিশুকে আত্মরক্ষা-সন্তুষ্ম রক্ষার জন্যে। অথচ ছেলে সন্তানকে এই ধরণের ঘৃণিত কাজ থেকে ফিরিয়ে আনার কথা

ভাবেনা । মা-বাবাকে সন্তানদের জন্য সময় দিতে হবে মোবাইল নয় হলি আটিসিশান ঘটনা একদিনে এই সন্তানগুলি একদিনে বিশ্বসন্গামী হয়নি । দিনের পর দিন মা-বাবাদের সাহচর্য থেকে বিরত থাকায় সে ফাঁকে দৃষ্টি হয় সেখানে এই দুষ্ট বৃক্ষগুলি জায়গা করে নেয় ।

আজ সময় এসেছে সমাজকে কলঙ্কমুক্ত করতে একত্রে হিংসা-বিহেন
ভুলে সত্তানদের সুন্দর পরিবেশ ও সুন্দর ভাবনার চিন্তা-চেতনায় সময়
দিয়ে, স্নেহ ও আদর দিয়ে, সুস্থ মানসিকতার সত্তানকে গড়ে তুলে, দেশের
শান্তি ও সন্তি ফিরিয়ে আনি।



শিক্ষা সফর ঢাকা উইমেন কলেজ, সিলটি চা বাণান

বিষ্ণু

ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥେ ବିଯେ କଥାଟିର ଅର୍ଥ ସାମାଜିକ ଓ ଧର୍ମବକ୍ଷନ । ଏକଟି ପୁରୁଷ ଓ ଏକଟି ନାରୀର ବଂଶ ପରାକ୍ରମେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରେ ଆସଛେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନେର ଆଚାର ଆଚାରଙ୍ଗେର ମାଧ୍ୟମେ । ହିନ୍ଦୁଦେର ଆଚରଣ ବ୍ୟାପକତା ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ଆଚାର-ଆଚରଣ ସବଚେଯେ ଦୀର୍ଘ ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ମାଧ୍ୟମେ ସମ୍ପଦ ହୁଯ । ଓରା ଆଗୁନକେ ସ୍ଵାକ୍ଷି ରେଖେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ମାଧ୍ୟମେ ବିଯେ ପ୍ରାଯ 3/4 ଦିନ ଧରେ ସମ୍ପଦ କରେ । ତୁଳନାମୂଳକଭାବେ ହିନ୍ଦୁଦେର ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ଅନେକ କମ ।

এখন আসা যাক বিয়ে কি, কেন বিয়ে হয়, যে কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হয় এই সব আমার দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা। যখন একটি মেয়ে এবং একটি ছেলে প্রাণ্ত বয়স অর্থাৎ মেয়েটির (১৬-১৮ বছর), ছেলেটির (২১-২৫) বছর অভিভাবকগণ বিয়ের কথা ভাবেন, বিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক সংস্কৃতিক ধর্মীয় প্রতিয়া। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েদের মা-বাবা ভাবেন তাই বলেন মেয়ের বিয়ে দিব। আর ছেলের বাবা-মা বলেন ক বিয়ে করাব। এই যে দেব-এবং করাব এর মধ্যে মেয়েদের একটু তুচ্ছ করা হয়। এর পরে আসে লেনদেন অর্থাৎ শান্তিক অর্থে। ছেলের অভিভাবকদের বায়না আর মেয়ের অভিভাবকদের অবনত হ্যাঁ (হ্যাঁ) বলার প্রবণতা খুশী ও সাধের মধ্যে মেয়ের অভিভাবক যা তা হয়। ভালবাসার স্নেহের দোওয়ার উপহার কিন্তু চুক্তি ও দাবী হয়। এর অপরাধ, স্নেহের দোওয়ার উপহার কিন্তু চুক্তি ও দাবী হলে হয় অপরাধ। সেখানে আমার কষ্ট ও আপত্তি একটি মেয়েকে তার বাবা-মা বোৰা মনে করে ঘাড় থেকে বোৰা নামাবার জন্য যৌতুকের ফাঁদে পড়ে নিজের মেয়েকে ছোট ও অপমান করছে তা অবচেতন মনে রাজী হন কেন? যত ধরণের নির্যাতন তার বেশীর ভাগ যৌতুকের জন্য। সেই অর্থ দিয়ে মেয়েটাকে মানুষ করার জন্য শিক্ষা দিতে পারেন শিক্ষা শুধু বই এর বিদ্যালয় যার যেমন মেধা সামাজিক অবস্থান সেই দিকে লক্ষ্য রেখে মানুষ হিসাবে তৈরী করা।

যতই বিয়ের পূর্ব ভালবাসা বিয়ে এবং ততই দ্রুত বিবাহ বিছেন্দ কেন? সাধারণ সাদামাটা উত্তর হল বিয়ের পূর্বে ও পরে যে ছেলে মেয়েদের এত স্বাধীনভাবে মেলামেশা মন যা চায় তাই করা কিন্তু পরে কিছুটা অনুশাসন

অনেক কিছু সামাজিক পত্রি মধ্যে এনে (না-হ্যা) মধ্যে চলতে হয়। ফলাফল যে বেশী স্বাধীনচেতা সে তখন এই বছন শৃঙ্খলাবদ্ধতা মানতে পারেনা। অথবা বিয়ের পূর্বে প্রেম করার সময় সময়সংক্ষণ থাকে না। দেখা হওয়া বা বেড়াতে যাওয়া পাওয়ার পর বিশেষ করে ছেলেটা তার জীবনের স্বাধীনতা পরিবর্তন না করে আগের মত উচ্ছৃঙ্খল জীবন যখন খুশী যা করার প্রবণতা বেশীর ভাল থেকে যায় ফলে নিয়ম কানুন ধার ধারে না যখন খুশী বাসায় ফেরা, বদ্ধ বাক্সবদের সাথে হৈ হৈ করা, আস্থা দিয়ে বাধন হারা পাখীর মতন জীবনে জবাব দিহিতা সহ্য করতে পারে না। অপর দিকে মেয়েটি চায় স্বামী হিসাবে দায়িত্ববোধ পুরুষ। আর সেই লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা বা বেড়ান হয় না কিংবা স্বামীকে একাত্তে না পাওয়ার অর্থিক দায়িত্ব বৈধানিকতা কমিটমেন্ট রক্ষা করতে না পারা অপেক্ষা করতে করতে ডাইনিং টেবিলে ঘুমিয়ে পরা প্রেমিক স্বামীর জন্য অপেক্ষা করার ফলে এক সময় মেয়েটা দেখে একি জীবন? উল্টাফল বিচ্ছেদ বগড়া চড়ান্ত পর্যায় হাড়া ছাঢ়ি। প্রেমের সময় দু'জন দায়িত্বহীন ভালবাসা যখন সামাজিক ত বক্ষন হয় তখন খুব কম বাস্তববাদী যুগল জীবন ধর্ম সমাজ সম চলতে পারে। কথায় আছে বিয়ে কিছু ফরমুলার মাধ্যমে টেকাতে । সম করে অন ভ্যাগ, সমজোতা, সহ্য, একে অন্যের দোষ না দেখে গুণ দেখে ইসা করা, সম্মান দিয়ে আচার আচরণ করা, পারিবারিক শান্তি বজায় রাখ্য জন্য একক সিদ্ধান্ত না নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সফলতা খোজা, আব হীন বক্ষন বেশীক্ষণ টেকান যায় না।

এর আরেকটা কারণ আর্থিক স্বাধীনতা মেয়েদের থাকায় পড়ে নিয়ম আকর্ষণহীন অভ্যন্তর আচরণ সহ্য করেনা ফলাফল বিবাহ বিচ্ছেদ।

বর্তমানে ভয়ের কারণ সারা পৃথিবীতে বিয়ের প্রতি সম্মান না থাকায় (লিভ টু গেদার) এক ধরণের অসামাজিক, অবক্ষয় ও অস্বাস্থ্যকর বক্ষন যা কোন অভিবাবক চান না। যে যার স্বাধীনতা বিসর্জন না দিয়ে যে ক'দিন ভাললাগে শারীরিক মিলনসহ বসবাস করে ভাল না লাগলে অথবা অন্য কাউকে ভাল লাগলে হান মানুষ পরিবর্তন করে। নারী নির্যাতন যেমন বিবাহ পূর্বে ও পরে অত্যন্ত ঘৃণিত কাজ, তেমনি এই ধরণের জীবন এর ভয়াবত্তা কত কি? কত খারাপ অসুখ হচ্ছে এ গুলি আল্ট্রাহর বিধানের যায় তখন আর কিছু করার থাকে না।

বিয়ের পর এর যে হিংস্রতা শুরু হয় যৌতুক নামক বড় সামাজিক ব্যাধির ফলে এসিড নিক্ষেপ, শারীরিক নির্যাতন অবৈধ বিবাহের পর অন্তর্ভুক্ত করা কিংবা দেহ ব্যবসায় জোরপূর্বক বাধ্য করায় অথবা বিয়ের পর চাকরি ব্যবসা যাই করুক তার অর্থেও পূর্ণ স্বাধীনতা হরণ করা অর্থাৎ বিয়ের পূর্বে বাবা-মা আর বিয়ের পর স্বামী শঙ্খর বাড়ীতে (অর্থ নির্যাতন) যার ফলে সর্বস্তরে বিয়ের আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে।

চলুন আমরা এই সামাজিক ব্যাধি থেকে আমাদের সন্তানদের রক্ষা করি। আমাদের সুখ-দুঃখ জীবন বাস্তবতা নিয়ে বদ্ধতপূর্ণ আলোচনা করি বিয়ে যে কত বড় মূল্যবান সামাজিক ধর্মীয় শারীরিক অনুশাসন পছন্দ তা এই প্রজন্মদেও সাথে খোলাখুলি আলোচনা ও মত বিনিময় করি। পারিবারিক শিক্ষা প্রতিফলন, সামাজিক সংগঠন ও সরকারি-বেসরকারি গর্হণ্যে এর সুফল বহু বিবাহের কিংবা জীবনের কুশল নিয়ে মত বিনিময় প্রক্রিয়ার প্রচলন করি। সর্বস্তরে এই নেটওয়ার্কের আওতায় আওতায় এনে বিভিন্ন সেমিনার নাটক বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রচলন কর্ম আশাবাদি নিশ্চয়ই এর সুফল অবশ্যই আসবে।



শার্জি, ফয়সাল ও অমি

জন্টা ক্লাবের ইতিহাস

বাফেলোতে ১৯১৯ সনে মারিয়ান জিলা ফরেস্ট উবস। তিনি কর্মজীবী মহিলাদের জন্য জন্টা সংগঠন গড়ে তুলেন। বর্তমানে ৩০,০০০ বেশী সদস্য জন্টা ক্লাবের সংখ্যা ১২০০ জন, ৬৭ দেশে। জন্টা আন্তর্জাতিক ক্লাব। এর মূল কথা—নারীর সন্মান, কর্মক্ষমতা উন্নয়ন, নারীর মেয়ে শিশু যে কোন ধরণের নির্যাতন বন্দ করা, প্রভেদ কমিয়ে আনা—শিক্ষাখাতে স্বাস্থ্যখাতে ও পারিবারিক-অফিসিয়াল পারিপার্শ্বিকতা প্রভেদ কমিয়ে আনা। মেয়ে মানুষ নয় “মানুষ হিসাবে অধিকার পাওয়া”, আর্থিক উন্নয়নের প্রচেষ্টায় নারী ও কল্যাণ সন্তানের আত্মর্যাদা উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ, জাতিসংঘের সহযোগিতা ও অন্যান্য এনজিও'র সহযোগিতার মাধ্যমে সব ধরণের শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক বিভেদ তুচ্ছতা দূরিকরণ মানব অধিকার প্রশংসন। পারিবারিক নির্যাতনের আইন প্রয়োগের মাধ্যম দিয়ে এনে শেষ করা। মেধাভিত্তিক আন্তর্জাতিক বৃত্তি প্রদান।



জন্টা ক্লাব আন্তর্জাতিক প্রেসিডেন্ট-এর সাথে আমি



জন্টা ক্লাব সদস্যদের সাথে আমি

জন্টাৰ ২০১৪-২০১৬ লক্ষ্য

১. Service-সেবা (প্রকল্পের মাধ্যমে)
২. Advocacy-আইন গত বৃদ্ধি দেওয়া
৩. Resources-সম্পদ বৃদ্ধিকল্পে সাহায্য করা সদস্য বাড়ান, Terise Project অনুদান, মেলা ও অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রকল্প (জন্টা ক্লাব ঢাকা-০১)

- (১) নার্সদের জন্য ইংরেজি ভাষার ট্রেনিং কল্পে অর্থ প্রদান। দশজন করে বছরে তিনটি ব্যাচ। সদস্যদের অনুমোদন হয়েছে। আলোচনা চলছে—সময় করে থেকে হবে।
- (২) জামদানি শাড়ী বুননের ট্রেনিং-৬-১২ জন করে বছরে তিন দল—অর্থ প্রদান করা এবং শুরু করা হয়েছে।
- (৩) আর্টিস্টিক অভিভাবকদেরকে মানসিক কষ্ট ও তাদের সন্তানদের বহুমুখি নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা করে কাউপিলিং ও মত বিনিয়য় (হয়েছে) বছরে তিন পর্বে শেষ হবে। Beautiful school সাথে কাজ।
- (৪) ঢাকা উইমেন কলেজ ইউনিভার্সিটি কলেজ সতর্কতামূলক আলোচনা-বাল্যবিবাহ, বিবাহবিচ্ছেদ ও মাদক প্রতিরোধ, (তারিখ অপেক্ষায়-ডিসেম্বর) Best student scholarship.

(৫) এইডস-সর্তকান্তামূলক র্যালী ও শিশুদের টি-শার্ট, সাবান ও খাদ্য বিতরণ ও আলোচনা সদস্যদের মধ্যে ৬ ডিসেম্বর ২০১৪ অনুষ্ঠিত হবে বলা হয়েছে। টিউবহোল, ল্যাটারিন, ওয়াশিং মেশিন, কম্বল ও টাওয়াল CAAP দেওয়া, ছোট ছোট ব্যবসায় আর্থিক অনুদান, পথশিল্পদের কম্পিউটার শেখান, হাঁটুর অপারেশনে অনুদান, অবস হওয়া হাত চিকিৎসা করা।



জন্টা নতুন প্রজেক্ট কম্পিউটার ট্রেনিং

জন্টা ক্লাব-০২

- (১) শিক্ষার জন্য সুবিধাবধিত শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষার প্রকল্প ও আর্থিক অনুদান মাইক্রোক্রেডিটের মাধ্যমে সিঙ্গার মেশিন দিয়ে ট্রেনিং দিয়ে আয়ের পথ করে দেওয়া।
- (০২) রানা প্রাজাৰ ভিকটিম একজন নারী শ্রমিকের মাথায় আঘাতপ্রাণ ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা দু'বছর মেয়াদে সাহায্য করা। পরবর্তীতে কর্মের পুনর্বাসন করা।
- (৩) সাবধানতা-শিক্ষামূলক সেমিনার সব ধরণের নারী নির্যাতনের প্রতিরোধমূলক অনুষ্ঠান করা।

জন্টা ক্লাব-০৩

- (১) শিক্ষা-চিকিৎসা সাবধানতামূলক অনুষ্ঠান ও সেমিনার।
- (২) গার্মেন্টসে কর্মজীবী নারীদের ট্রেনিং দিয়ে পুনর্বাসন করা।
- (৩) এসিড বার্গ ২ জন নারীকে চিকিৎসা ও পুনর্বাসন করা।
- (৪) হাজারীবাগে আগুনে পুড়ে যাওয়া মানুষের জন্য কাপড় এবং ৪০,০০০ (চাল্লিশ হাজার) টাকা অনুদান দেওয়া।

ক্লাব-০৪

- (১) নারী নির্যাতন শুধু শারীরিক নির্যাতন নয়, ফিস্টুলা নামক আরও কিছু ভয়ঙ্কর ব্যাধি হলে নারীকে সামাজিক ও শারীরিকভাবে নির্যাতনের শিকার হতে হয়। সেই ফিস্টুলা রোগীদের সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ক্লাব-০৪। ঠাট্টাটাটা মেয়ে শিশুদের চিকিৎসা।
- (২) মাইক্রো ফিন্যান্স-ট্রেনিং দিয়ে, অর্থ ঋণ দিয়ে সাহায্য এবং বিত্তির মাধ্যমে তারা আবার ঋণ শোধ করার প্রকল্প।
- (৩) মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধীদের হাতের কাজ শিখিয়ে প্রত্যরোধশীল করা।
- (৪) বাংলাদেশ জাতীয় আইনী সংস্থাদের সাথে একত্রে প্রাণ-গৰ্ভবতী মেয়ে শিশুদের সাহায্য করারাছে।
- (৫) "শিশু বিকাশ কেন্দ্র" সুবিধাবধিত শিশুদের শিক্ষাগত কর্মসংহারণ।

না প্রাজা ও জামদানী প্রকল্প সব ক্লাব কাজ কছে। সর্বোপরি জানাতে চাই, আমরা সব ধরনের বৈষম্য ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে একত্রে আওয়াজ তুলছি—"Say- no to violence against women and girls".

- (1) To improve women life style
- (2) Stop men-women gender division good education and all other facilities.
- (3) Stop under age marriage.

জন্টা ক্লাবের প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য একজন নারীকে অবহেলিত থেকে নিজেকে আত্মস্বাবলম্বী করে তোলা। আর্থিক স্বাবলম্বী হয়ে নিজের উপার্জন এবং সিদ্ধান্ত নিয়ে ঘরে-বাইরে নিজেকে সন্মানিত মর্যাদাসম্পন্ন করে তোলা।

সেক্ষেত্রে জন্টা ক্লাব বিভিন্ন প্রজেক্টের কাজ করে থাকে।

জন্টা ক্লাব-০১:-

(১) এইচস-এ আক্রান্ত নারীদের জন্য CAAAP সংযুক্ত হয়ে ওয়াশিং মেশিন দিয়েছি। টাওয়েল, কম্বল, এলাকা ভিত্তিক টিউবওয়েল এবং সেনিটেশন-এর ব্যবস্থা, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সাহায্য করে ওদের আবার কর্মজীবনে ফিরিয়ে আনাই আমাদের উদ্দেশ্য।

(২) নার্সিং প্রকল্প, অনুদান এবং ইংরেজি মেডিকেল ভাষা শিক্ষার কেচিং সেন্টার প্রয়োজনে সাহায্য করা। এতে করে দেশের বাইরে তাদের চাকরীর সুবিধা হবে। ৩,৩০,০০০ (তিনি লক্ষ ত্রিশ হাজার) নারীর মধ্যে ৬৬ জন নারীকে ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

(৩) আটিস্টিক শিশুদের প্রকল্পে ওরা চমৎকার কার্ড তেরি করে হাতের কাজ শিখে। অভিভাবক আত্মসম্মান ও সাহস দেওয়া।

(৪) রানা প্রাজা ভিকটিম ২ বছরের মেয়াদে সাহায্য ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা একাউন্ট মারফত বেবী আকতার নামে নারী শ্রমিক-১৮ মেরুদণ্ড ভেঙে যাওয়াই তার সুস্থিতার মাধ্যমে পুনর্বাসন করা হবে।

(৫) রূপগঞ্জে জামদানী প্রকল্প এটা জন্টা ক্লাব মিলিং কল্প সুবিধাবৃক্ষিত শিশুদের বিদ্যালয় এবং যে নারী বুনন কাজ করে দের নেশ্যুবিদ্যালয়। কারণ শিক্ষার বিকল্প নেই।



জন্টা ক্লাব ০১-এর নতুন প্রজেক্ট

(৬) Workshop-Tosin prevention from food and environment-end of the December on 1st Journey

(৭) সচেতনতা বয়স ও সুন্দর সমতা রাখা (ফেরুজারি)

(৮) ওজন সমতা রেখে সুস্থ থাকা-আলোচনা Workshop (এপ্রিল)

(৯) কোমর ভাঙা ও চিকিৎসার (সারজারী আর্থিক অনুদান) সুস্থ হয়ে নিজ কর্ম সংস্থান। এছাড়া আমাদের আন্তর্জাতিক জন্টা তে আছে সেগুলো আমরা সকালে মিলে উদয়াপন করে থাকি। ১৫তম আন্তর্জাতিক জন্টা ক্লাব দিবস, ইউএনও দিবস, নারী এন্টারপ্রেনার তে, অরেঞ্জ তে, উদয়াপন হয়েছে। Zonta club UNO সাথে সংযুক্ত।

(১০) ৩০০ ফিট রাস্তা পূর্বাচল মহিলা ক্লাব ব্যবসায়ীদের আর্থিক অনুদান ও লাভ ছাড়া ঝণ প্রদান (৫ টি) করা।

(১১) শিশু সমাজকে জ্ঞানের আলোতে উত্তোলিত করে। বারিধারা ইঞ্জিনিয়ারিং ফাউন্ডেশন ZCD-01 শিক্ষা Computer আর্থিক অনুদান দেওয়ার প্রচেষ্টা আগ্রহে করার অনুমোদন নিয়েছি।

তিটি কাজ কিন্তু আমাদের তত্ত্বাচাল পর্যায়ে নারী মেয়ে শিশুর জন্য এছাড়া বিভিন্ন নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইনী সহায়তা ও নমুনাক সভা-সেমিনার করা হয়।



জন্টা ক্লাবের সামিতি থেকে আমার বিদ্যার কুমুর আগ্রহ।
পাশে নাজমা আপা, হাসনা আপা ও কাকলী

চলার পথে যাদের পেয়েছি

জীবনে মানুষের চলার পথে চলতে চলতে ভাল-মন্দ, কষ্ট-দুঃখ অনেক ধরণের চরিত্রের মানুষের সাথে দেখা হয়। কিছু মনে থাকে কিছু শৃঙ্খলির অভ্যন্তরে হারিয়ে যায়। প্রায় অর্ধশত বছরের বেশী জীবন পেরিয়ে এসে একটি কথা বার বার মনে পড়ে। বাল্যস্মৃতির চাইতে মধুর শৃঙ্খলা আর কিছুই নেই। যৌবনের উচ্ছ্঵াস দমকা হাওয়ার মত সব উড়িয়ে-ভাসিয়ে নিয়ে যায়। কেউবা মুখ ধূবড়ে হোচ্চট খেয়ে পড়ে যায় আবার কেউবা সমন্বের চেতুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে আনন্দে জীবন কাটিয়ে দেয়। বার্ধক্য বড়ই অনিষ্টিত কারণ 'সাঙ্গ-অর্থ-এ' দুটোর সমন্বয়ে নির্ভর করে কিভাবে বাকী জীবন কাটাব।



তলির সাথে আমি

যা হোক মানুষ তারপরও আশায় থাকে কখন একটু খুশি-আনন্দ তার জীবনটাকে সুন্দর আলোকিত করে আনন্দ ছড়িয়ে দিবে। চলার পথে এমন কিছু মানুষ আমার জীবনে পেয়েছি সত্য তারা ভালই নয় বিশ্বস্ত পর-উপকারী। সর্বপ্রথম মনে পড়ে নাজমা হুদা (পগি) জন্টা ক্লাব সিনিয়র মেম্বার। এত ভাল মানুষ আমি কর্ম দেখেছি। কত অন্তর বয়সে বিধবা হয়ে শক্ত হাতে

আমার লেখা / ১১৪

সমাজের চোখ রাখানোকে ভয় না করে স্বামীর ব্যবসায় হাল ধরেছেন। বর্তমানে তার বয়স ৭০+। মানুষের উপকার করেই যাচ্ছেন কিছু পাওয়ার জন্য নয়। জন্টা ক্লাবের প্রেসিডেন্ট হয়ে উনার সাথে আমার অসম বন্ধুত্ব হয়েছে। আমাদের কাজে তিনি যথেষ্ট আর্থিক অনুদান রেখেছেন ৩,০০,০০০ (তিনি লক্ষ) টাকার মত। যখন আর্থিক সমস্যা হয়েছে তখনই তিনি হাসি মুখে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এরপর আসে তাহমিনা আপার কথা। যখন অর্থ, গাড়ী যে কোন সমস্যায় পড়েছি তখনও তিনি সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। সব সময় হাসি-খুশি একজন মানুষ মমতায় ভরা মুখখানি। তার মেয়ে এই প্রজন্মের ফারিয়া কিছু মনে হবে আমাদের বাল্যবন্ধু। চমৎকার তার ব্যবহার হাসি-খুশি। বাবা মারা গিয়েছে প্রায় সাত বছর। মা, তিনি ভাইবোন ও ভাইয়ের বৌ-বাবার অভাবটা কেউ কাউকে বুবাতেই দেয় না। আমার এত ভাল লাগে এই সুন্দর হাসি-খুশি পরিবার আমাদের ভীষণ সন্ধান ও ভালবাসে সময় দেয়। আল্লাহ ওদের শান্তি ও সুখে রাখুন।

চলার পথে আরও কিছু মানুষ যেমন হাসনা মণ্ডুদ, নাসরিন আপনা, শাহরুক আপা, ফাহমিদা আপা, দিলরুবা আপা, মনিরা আপা, টোকন আপা, জায়েদা আপা, ইসরানা আপা এত চমৎকর ব্যক্তিদের সংস্পর্শে এসে আমি নিজে আলোকিত হয়েছি। ওনারা স্ব-স্ব অবস্থানে অনেক উঁচু অবস্থানে আছেন। ওনাদের কথা কখনও ভোলা যাবে না।



নাত বৌদের সাথে আমার মা ও বোন

আমার লেখা / ১১৫

আমার ছেট অথচ পরিচয়ে নিজ নিজ অবস্থানে অনেক উচুতে। এমন কিছু মানুষ তাদের সংস্পর্শে এসে আমার কাজের শক্তি বিগুণ হয়েছে তারা-হেলেনা জাহাঙ্গীর, উজ্জ্বল হাসি-খুশি প্রাণবন্ত মেয়ে। ছেট বেলায় বিয়ে হয়ে দমে যায়নি। বর্তমানে যে নিজের কর্মসূচিমে উজ্জ্বল নক্ষত্র। নিজের ৩টি গার্মেন্টস, জয়বাজাৰ ফাউন্ডেশন অনেক সংগঠনের সদস্য। বর্তমানে প্রচণ্ড লড়াই করে ব্যবসায়িক সংগঠনের পরিচালক পদ। রোটারির ভাইস গভর্নর আৰ আমার অতি আদরের জন্ম মেষ্টার। আমার গৰ্ব, তাৰ সুস্থ জীৱন কামনা কৰি।

ড: বুমুখান সে বর্তমানে জেসিডি-০১ প্ৰেসিডেন্ট। বহুমুখি প্ৰতিভা, গায়িকা, ডাঙৰ, রোটারিৰ ভাইস গভর্নৰ, ওকে আমি ভালবাসি। এই অন্ন বয়সে এত কিছু সামাল দেওয়া (টটা ক্লিনিক) রোগী দেখা বিশাল ব্যাপার। ও আমার গৰ্ব।

ফারহানা বর্তমানে Austrelion International School ZCD-01 Secretary। ভীষণ অমায়িক, কৰ্মসূচী, মেধাবী, আমার ভীষণ ভালাগার ছেট বোন। চমৎকাৰ তাৰ ব্যবহাৰ, কড়িৎ কৰ্মা এবং তন্দু আমাৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি।

মায়া, কাস্তা, শিলা, শামিমা আলম, হেলেন আকতার, কাকে তানা, ফারহানা, সিলভী, মিলি, জলি ZCD-01 সকল সদস্য সকলবে আমাৰ অতি আপনজন। সকলৰে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি।

এবাৰ আশা যাক উত্তো লেডিজ ক্লাব প্ৰায় ২৬ বছৰ ধৰে আমাৰ বিশেষ কৰে কাৰ্যকৰি কমিটিৰ ১৩ জন সভান্তোৱা জাহানারা ইসলাম গ্ৰথম তিপি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অগ্ৰিকল্যান্ড তাৰ সঙে কত ভাল-মন্দ ঘটনা সাথে পথ চলছি। ওনাৰ সাহস, মেধা ও কৰ্মদক্ষতা দেখে আমি মাঝে মাঝে অবাক হয়ে যাই। ৭৮ বছৰ বয়সে যেভাবে ঘৰে-বাইৰে দক্ষতাৰ পৰিচয় দিয়েছেন মনে মনে ভাৰি, আমাৰ কি পাৰব? ওনাৰ সাহচৰ্য্য আমাৰ নৌকাৰ দাঁড় বেঘে যাচ্ছি উনি নাৰিক লক্ষ্যে পৌছান, আমাদেৱ সকলৰে শপথ। চলাৰ পথে শাহীন ফাৰুক, সুৱাইয়া হক ভাৰী, রোকসানা, ইসমে আৱা, সেলিনা, মীৱা, লুৎফুন নাহার আপা, খালেদা, রোজী, তাহেৱা আপা, ত্ৰি: রাজিয়া আপা সকলৰে সাথে বিগত ২৫ বছৰ ধৰে আমাদেৱ অটুট বকল। শুধুমাত্ৰ অটুট বকল নয় সুখ-দুঃখেৰ সাথীও বচ্চে। আৱেকজনাৰ নাম না বললে নয়, তিনি আমাদেৱ অসম বয়সী বকু-বোন জামিলা আপা যিনি নিজ অঙ্গনে অধ্যাপনাৰ সূত্ৰে আমাৰ পৰিচয় ঢাকা উইমেন কলেজে। পৱৰতীতে তিনি আমাকে উত্তো লেডিজ ক্লাবে নিয়ে আসেন। তাৰ স্বামী ড. আলাউদ্দিন আল আজাদ বাংলাৰ শিক্ষক। সংকৃতি অঙ্গনে একজন

ক্ৰিবতাৰা, জাহানারা ইসলাম ও জামিলা আজাদ দুই সহদৰা এবং তাদেৱ ভাই বীৱশ্ৰেষ্ঠ মতিউৰ রহমান। এই সব পৰিবাৰেৰ সাথে দেখা হত না যদি আমি উত্তো লেডিজ ক্লাবে না আসতাম।



পিকনিক-এ দুলাভাইসহ আমাৰ ক'জন

এবাৰ আৰ একটি অঙ্গন তা হল আমাৰ শিক্ষা জীৱনেৰ মূল্যবান ২৫টি বছৰ ঢাকা উইমেন কলেজ ও ইউনিভার্সিটি। বেগম রোকেয়াৰ গল্প আমাৰ পড়েছি। জীৱত বেগম রোকেয়া যাকে পেলাম এই কলেজে এসে। তিনি বর্তমানে মৰহূম তৌফিকা মাহমুদ এবং ত'ৰ সৰ্বাঙ্গিন বকু ভাল কাজেৰ সঙ্গি সালেহা আপা এৱা এক একজন নক্ষত্র। নিজ আকাশে জুলজুল আলোকময়। শক্তি ও সাহস থাকলৈ একজন নারী পুৱৰষেৰ চাইতে বেশি কাজ কৰতে পাৱেন তাৰ জলজ্যান্ত প্ৰমাণ তৌফিকা মাহমুদ। অসমৰকে সম্ভাৰ কৰা কাকে বলে তা তৌফিকা আপাকে না দেখলে ভাৰা যায় না। মাত্ৰ ২৫/৩০ জন ছাত্ৰী আৰ ১০/১৫ জন শিক্ষিকা বিনা বেতনে ৭টি বছৰ কঠিন মৰুপথ পাৰ কৰেছি যাব নিৰ্দেশনায় তাৰ নাম তৌফিকা মাহমুদ। ৭ বছৰ পাৰে সৱকাৰী অনুদান নেওয়া তাৰ অনেক যুক্ত কৰে শেষদিন অনুমোদন পাওয়া যায়। আজ সেই শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানে ২৫০০/৩০০০ ছাত্ৰী ৪টি বিষয়ে সন্মান ও মাস্টার্স। বিভাগীয় প্ৰধান নিয়ে জমজমাট শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান, সব কষ্ট ভুলে এখন দেখি সেই পানিৰ জমিতে বিশাল অটালিকা, মল, প্ৰাণ ভৱে যায়।

কত ছাত্রী পার করেছি তার মধ্যে ধ্রুবতারা গার্হস্থ্য অর্থনীতির সম্মান বিভাগের ছাত্রী বুসরাত নিতু। প্রথম বিভাগে প্রথম হয়েছে। সন্মান ও মাস্টার্স। আমরা শিক্ষক জীবনে সবচেয়ে পরম পাওনা জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের আভারে। একই বছর আমার আরও দুই ছাত্রী ৭ম ও ১১তম হয়েছিল। আমার কিছু চাওয়ার নেই এই প্রথম পাওয়া। যেদিন তাদের সহবর্ণী দেওয়া হয়েছিল। আমার খুশি দেখে মিডিয়ার লোক প্রশ্ন করেছিল “ওকি আপনার মেয়ে”, আমি বলেছিলাম, হ্যাঁ আল্লাহর রহমতে আমার দুই মেয়ে সুখী ও সোমা দু’জন প্রতিষ্ঠিত ভাল ফলাফল করেছে। NSU থেকে সুখী ডিপ্রী ও এমবিএ করে স্ব-প্রতিষ্ঠানে ব্যবসা করছে। সোমা NSU থেকে ডিপ্রী ও অস্ট্রেলিয়া মোনাস ইউনিভার্সিটি থেকে MS করে বর্তমানে NSU-তে মার্কেটিং বিভাগে শিক্ষকতা করছে। আল্লাহর কাছে অনেক শুকরিয়া নিজ কল্যান্নয় ও আমার ছাত্রী আমাকে সকলেই নিরাশ করেনি। আমার শিক্ষকতা জীবনে যাদের ভালবাসা আমাকে এখন জড়িয়ে রেখেছে—তারা হল, জিনাত চাঁদ, শিল্পী, ফারহাত, নাজুর রোকসানা, আজাদ, নাসরিনছয়, শিরিন গাজী, বাতেন, হাফিজুর রহ মুক্ত ফেরদৌসী, লাভলী আপা, রুহী আপা প্রায় সক থাকবে। সকলের নাম লেখা সম্ভব নয়, ইঞ্জিনিয়ার্স আইই মায়া, বুসরা, লিলি আপা, বিলকিস আরও অনেককে আমার পারি এই পৃথিবী থেকে। এটাই সবার কাম্য হোক।



আমার মা
আমার লেখা / ১১৮



আমার একমাত্র মামা আমির আলী বান



জন্টা ক্লাব-০১ এর সেক্রেটারী ফারহানা



আনন্দঘন মুহূর্ত লুজিয়ানা, আমেরিকা



মুন্মুন আপা, মিরান ও আমি



ফারিয়া হিউস্টন



লালপ ক্লাবে একদিন

আমার লেখা / ১২০



একদা আমরা দু'জন

আমার লেখা / ১২১



তাহমিনা আপা ও তার বেয়াইন, সাথে শাহীন ও আমি, লুজিয়ানা



বয়জেষ্ট্য বোন ও তার মেয়ের সাথে আমি



লায়স ক্লাবের এক অনুষ্ঠানে আমি



সুলত মুহূর্তে আমরা কঁজন



ছেটি ভাই তুরান ও তার পরিবার



১৪তম জন্ম কনভেনশন



আমার ভাই-বোন, ভাষ্যা-ভাণ্ডি



নভচারীদের সাথে আমি (নামা)



১৪তম জন্ম ত্রাব ফান্ডেশনে গভর্নর ফাহিমদা করিম-এর কাছ থেকে পূরকার নিষেন
হোসেনে আবা ইন্দ্রিস

আমার লেখা / ১২৬



হংক ইয়ারপোর্ট



আটলাটা সিটি, আমেরিকা



সঙ্গীত শিল্পী রাশিদা বানুর সাথে আমরা ক'জন

আমার লেখা / ১২৭



১৪তম জন্মী গ্রাব কনভেনশনে গভর্নর ফাহমিদা করিম-এর কাছ থেকে পুরকার নিজেন
হোসনে আরা ইদ্রিস

আমার লেখা / ১২৬



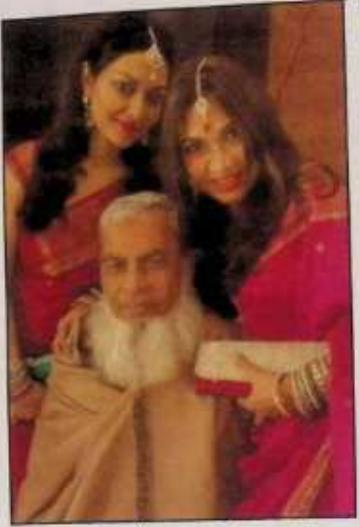
হংক ইয়ারপোর্ট

অটলান্টা সিটি, আমেরিকা



সঙ্গীত শিল্পী রাণিদা বানুর সাথে আমরা ক'জন

আমার লেখা / ১২৭



সোমা ও সুখির সাথে তাদের বাবা



নিউজিল্যান্ডে
বি



সোনারগাঁও লিচু বাগানে আমি



আমি আমার বাসায়